আমি শক্ত মনে,
ব্যথিত পরাণে,
কি যাতনা সই,
কি বেদনা বই,
বুঝিতে পারনা ? ॥

(৫)

মস্তকে কঠোর,
অদৃষ্ট দুর্ব্বার !
দেহে শত শত,
ক্ষত অগণিত !
ক্ষত বক্ষস্থল,
ক্ষত বাহুবল,
চরণে অপার
অনন্ত শৃঙ্খল !

(৬)

প্রকৃতির সনে,
আপনার মনে,
নিয়ত বিবাদ,
নিত্য সংঘটন ;
শান্তি-সুসঙ্গীত
বহেনা সমীরে
সংসার প্রান্তরে।
বিশ্ব দ্বন্দ-ময়,
বিশ্ব পূর্ণময় ;
কভু মিটিল না
প্রাণের বাসনা।
সে অতৃপ্ত শ্বাস,
অতৃপ্ত পরশ
এখনো অন্তরে ;
বড় আশা ভরে,
আজি গো দুয়ারে,
লও গো সন্তানে
আবার চরণে।

(৭)

প্রতীপ পবন,
অজ্ঞাত ছুটিয়া,
বহি নিয়া গেল
দিক্ দিগন্তর ;
সুরম্য, মধুর,
সুগন্ধ, সুরস,
রূপের কিরণ,
মৃদুল পরশ,—
পাইলাম পথে ;
হাসিতে হাসিতে,
বাহু প্রসারিয়া
ধরিলাম প্রাণে ;
ক্ষত বক্ষস্থল,
ক্ষত আত্ম-বল,
কলঙ্কের রেখা,
অনুতাপ-শিখা,
চির দিন তরে
রহিল আমারে !

(৮)

লও, মা ! অন্তরে,
আমি গো দুয়ারে,
ডাকি ধীরে ধীরে,
আঘাত পাই !
মরম বেদনা,
বহিতে পারিনা,
শোকের পেষণে
ভাঙ্গিয়া যাই !

(৯)

তোমার অন্তরে
রব লুকাইয়া ;
যাইব ভুলিয়া
হৃদয়ের ভার ;
জানি না কেমন
নিরবাণ ধন,

অতীন্দ্রিয় জ্ঞান,
সে অনন্ত-পার।
(১০)
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে
প্রাণ মিলাইয়া,
অনন্ত হইয়া,
রব লুকাইয়া!
বাসনা আমার
ভুলিতে সংসার,
ভুলিতে অপার
জনম ভার!

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

সাংখ্যদর্শন।

বৈদিক সময়ের অব্যবহিত পরেই আর্য্যদের দর্শন শাস্ত্রগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। এই দর্শন গুলির মধ্যে দুই খানি প্রধান, সাংখ্য ও বেদান্ত। ইহাদেরই উপর প্রকৃত পক্ষে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বেদের উপনিষদে যে নির্ম্মল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অবতারণা আছে,তাহারই উপর বেদান্ত দর্শন সৃষ্ট হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শন মতে, এই সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগত এক অনাদি, অনন্ত, নিশ্চল ব্রহ্ম হইতে জাত। তিনিই জগতের স্রষ্টা, এবং সৃষ্ট এই জগতের আদিকারণ ও উপাদান কারণ। এই সৃষ্ট জগত ব্রহ্মের মায়া বা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন। আমরাও সেই নির্গুণ ব্রহ্মের অংশমাত্র—তবে তাঁহার যে অংশ হইতে এই ভৌতিক জগত সৃষ্ট হইয়াছে, সেই মায়ার দ্বারা আমরা আচ্ছন্ন থাকি বলিয়া তাহা বুঝিতে পারি না।

সে যাহা হউক, এই বৈদিক দর্শনের প্রভাব আর্য্যদিগের ধর্ম্মের উপর প্রথমে অধিক দিন থাকে নাই। বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব হইতে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব অনেক কমিয়া যায়; সেই সময় সাংখ্য মতই প্রবল হয়, এবং ইহারই উপর তখনকার পুরাণ প্রভৃতি সংগঠিত হইয়া, অথবা ইহার পূর্ব্বে যেরূপ পৌত্তলিকতা ছিল, তাহা, সংশোধিত হইয়া এই সাংখ্য দর্শনের মতেই তাহার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।

তৎপরে পুরাণের পর, যে সকল তন্ত্র শাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং যে তান্ত্রিক ধর্ম্ম এক্ষণে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষেই ব্যাপিয়া আছে, তাহারও ভিত্তি এই সাংখ্যদর্শনের উপর সংস্থাপিত। প্রকৃতি, পুরুষ, শক্তি প্রভৃতি হইতে যে সকল দেবদেবী কল্পিত হইয়াছে, তাহাই একথা প্রমাণীকৃত করিতেছে। তন্ত্র ব্যতীত, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম যদিও মূলত তান্ত্রিক ধর্ম্মের অংশ মাত্র, তথাপি তাহারও দর্শন অংশ সাংখ্যের দর্শনের অনুরূপ।

এ সকল বিষয় আমাদের অধিক দেখাইবার আবশ্যক নাই। বৈদিক ধর্ম্ম যাহাই হউক, হিন্দুদিগের পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম যে সাংখ্যদর্শনের উপর সংস্থাপিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। অনেকের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মই কেবল দর্শনের উপর সংস্থাপিত (metaphysical religion),জগতে আর কোথাও কোন ধর্ম্ম নাই, যাহার মূল ভিত্তি জটিল দর্শন শাস্ত্র। কিন্তু উপরে যাহা দেখাইলাম,তাহা হইতে বোধ হয় ইহা বুঝা যাইবে যে, এমন কি, হিন্দুদিগের তামসিক

পৌত্তলিক ধর্ম্মও কাহারও স্বকপোল কল্পিত নহে। তাহারও মূল, জটিল সাংখ্যদর্শনের উপর দৃঢ় সংস্থাপিত।

এই সাংখ্যশাস্ত্রের এইরূপ প্রভাব বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তৎপরে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। তিনি সম্ভবত ইংরাজি নবম শতাব্দির প্রথমেই জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই বেদান্ত-শাস্ত্র পুণর্জ্জীবিত করেন। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ পুনর্ব্বার ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার করেন। এই সময় হইতেই অদ্বৈতবাদ মত সাধারণে অত্যন্ত আদৃত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, সাংখ্যদর্শনের প্রাদুর্ভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যতদিন তান্ত্রিক ধর্ম্ম থাকিবে, যতদিন তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের দেশে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন সাংখ্যমত একেবারে দূর হইবে না। আর্য্যেরা যখন বুঝিয়াছিলেন যে, সাংখ্যের সমান জ্ঞানী নাই, কপিলের মত পণ্ডিত নাই, তখন এক সময় ইহার কতদূর প্রাদুর্ভাব ছিল, বেশ বুঝা যায়। আমরা এস্থলে সেই সাংখ্যদর্শন কি, তাহাই সংক্ষেপে দেখাইব।

সাংখ্যদর্শনের প্রথম কথা, ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি কিরূপে সম্ভব, তাহাই দেখাইয়া দেওয়া। যতদিন মানুষের ইহজীবনের সহিত সংশ্রব থাকে, যতদিন তাহাকে একজন্ম হইতে আর একজন্ম ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তত দিন তাহার এই দুঃখের সহিত সম্বন্ধ অনিবার্য্য। অতএব মানুষের যাহাতে দুঃখ নিবারণ হইতে পারে, তাহারই জন্য চেষ্টা করা, তাহার উপায় স্থির করা, ও তদনুসারে কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। এক কথায়, যাহাতে মানুষের মুক্তি হয়, এই সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে রহিত হয়, তাহা দেখান সাঙ্খ্যদর্শনের উদ্দেশ্য।

অতএব ইংরাজীতে যাহাকে মনোবিজ্ঞান বা (Philosophy) বলে, সাংখ্যদর্শন সেরূপ নহে। ইহাতে Science এবং Art বা Practice উভয়ই আছে। প্রথমত সাঙ্খ্যকার দেখাইয়াছেন যে, মানুষের আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের মন বা বুদ্ধি বৃত্তি, ইচ্ছাবৃত্তি বা কার্য্যকারিণী বৃত্তি গুলি প্রকৃতি হইতে জাত। সাঙ্খ্যকার একথা প্রমাণ দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মনের বৃত্তি গুলি কি কি, তাহাদের ক্রিয়ারূপ প্রকৃতি হইতে তাহারা কিরূপে জাত, তাহা সাঙ্খ্যকার বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। শেষে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আমাদের আত্মা প্রকৃতিভিন্ন, মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে যত দিন এই জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, তত দিন তাহার সহিত মনের কখন অত্যন্ত বিচ্ছেদ হয় না। মৃত্যুকালে আত্মা মনের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পঞ্চভৌতিক শরীর হইতে বিভিন্ন হইয়া যায়। এই মনের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই আত্মা জগতের সহিত লিপ্ত থাকে। এবং তাহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং সাঙ্খ্যমতে ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণের জন্য—আত্মার মুক্তির জন্য, প্রকৃতির সহিত তাহার সংশ্রব একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে—মনের সহিত ও তাহার সংশ্রব দূর করিতে হইবে।

সাঙ্খ্যদর্শনের মূল বিবরণ অতি সংক্ষেপে সাঙ্খ্যকারিকাতে বিবৃত আছে। আমরা এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সাঙ্খ্য-

দর্শনের মূলতত্ত্ব পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিব।

সাঙ্খ্যমতে দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। বলিয়াছি ত, এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণের উপায় স্থির করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শ্রুতিতে এই দুঃখ দূরীকরণের যে উপায় উল্লিখিত আছে, তাহা অতি সামান্য,জটিল, অবিশুদ্ধ, অসম্পূর্ণ ও অনাবশ্যকীয়। ইহাতে দুঃখ-ত্রয়ের আপত নিবারণের উপায় নির্দ্ধারিত থাকিলেও, ইহাদের একেবারে বিনাশ করিবার উপায় স্থিরীকৃত হয় নাই। যে জ্ঞান দ্বারা ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রকৃতির ক্রিয়া এবং আত্মা বা পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি হয়,তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—ইহা দ্বারাই মুক্তি সংসাধিত হয়। সাঙ্খ্যকার দেখাইয়াছেন যে, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন শক্তি বা (পদার্থের ?) সাম্যাবস্থা যে মূল প্রকৃতি, তাহা অবিকৃত। ইহা হইতে পুরুষের সান্নিধ্য জন্য মহতাদি প্রকৃতি--বিকৃতি সাত প্রকার। প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিকৃত অবস্থা ষোড়শ প্রকার এবং পুরুষ, অবিকৃত ও প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এ তত্ত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা সাঙ্খ্যকার বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি ন্যায় যুক্তি (বা logic শাস্ত্রের মূল সূত্র) অবলম্বন করিয়া, কিরূপে এবিষয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রমাণ (Inference) তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত বাক্য (বা শ্রুতির বচন)। ইহা হইতেই সর্ব্ব প্রকার প্রমাণ সিদ্ধ হয়। সাঙ্খ্যমতে ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ইহা দ্বারা প্রমেয় বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। বিষয় সকল (objects) আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইলেই প্রত্যক্ষীভূত হয়।

অনুমান তিন প্রকার—পূর্ববৎ (deduction) শেষবৎ (induction), ও সামান্য (analogy)। এবং বেদের প্রমাণই (আচার্য্য ও ব্রহ্মার বচন) আপ্তবাক্য। অনুমান দ্বারাই সামান্যত অতীন্দ্রিয় পদার্থে জ্ঞান জন্মায়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থেরই প্রত্যক্ষ হয়। এবং এই উভয় উপায়ে যাহা স্থিরীকৃত হয় না, তাহাই আপ্তবাক্য দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অধিক দূরত্ব জন্য বা অত্যন্ত নৈকট্য বশত ইন্দ্রিয়ের দোষ জন্য—অন্যমনস্ক জন্য—অতি সূক্ষ্ম জন্য—অন্য বস্তুর ব্যবধান জন্য—অন্য বস্তু দ্বারা অভিভূত থাকিলে এবং সমান পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকিলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থেরও প্রত্যক্ষসিদ্ধি হয় না।

সাঙ্খ্যকার জগতের মূলতত্ব প্রমাণের এইরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া কিরূপে তাহার অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন, তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভব নহে। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহা অসৎ হইতে উৎপত্তি হইতে পারে না (nothing comes from nothing)। উপযুক্ত কারণ হইতেই তদুপযুক্ত কার্য্য উৎপন্ন হয়। কার্য্য, কারণের স্বরূপ বা সমপ্রকৃতি। আর যখন যাহা বিনষ্ট হয়, তাহা তখন আপন কারণেই বিলীন হয়—তাহার একেবারে ধ্বংশ হয় না। আর এককথা, কার্য্য অপেক্ষা কারণ অধিক সূক্ষ্মতর ও অধিক ব্যাপক।

এই কথা সিদ্ধান্ত করিয়া সাঙ্খ্যকার বলিয়াছেন যে, মূল প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার উপলব্ধি (প্রত্যক্ষসিদ্ধ) হয়

না। কিন্তু তাই বলিয়া মূলপ্রকৃতি নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে। কার্য্য হইতেই তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়—(এবং সমস্ত প্রাকৃত পদার্থই ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া, মূল প্রকৃতিও যে ত্রিগুণসম্পন্ন বা তিনটী মূলশক্তিতে গঠিত, তাহাও প্রতিপন্ন হয়)। মহৎ প্রভৃতি সমুদয়ই প্রকৃতির কার্য্য। তবে ব্যক্তাবস্থায় বা প্রকৃতির বিকৃত অবস্থায় যে ধর্ম্ম অব্যক্ত, প্রকৃতির ধর্ম্ম তাহার বিপরীত। তাঁহার মতে ব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকলের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, তাহারা সহেতুক, অনিত্য, পরিমেয়, ক্রিয়াশীল, বহুরূপ, কারণাধীন, কারণেই লীন হয়, ও অবয়ববিশিষ্ট। আর বলিয়াছিত, অব্যক্ত প্রকৃতি ইহার বিপরীত গুণযুক্ত। তবে ব্যক্ত ও অব্যক্ত প্রভৃতি উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, তাহারা ত্রিগুণাত্মক, জড়, (সাধারণ) অচেতন, ক্রিয়াশীল (প্রসবধর্ম্মী), ও আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত (objective), কিন্তু পুরুষ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সাংখ্যকার দেখাইয়াছেন যে, যখন বিভিন্ন পদার্থ মাত্রেরই পরিমাণ আছে, সমন্বয় আছে, (অর্থাৎ যখন তাহারা কতকগুলি সাধারণ গুণবিশিষ্ট);—যখন শক্তি হইতেই তাহাদের প্রবৃত্তি বা উৎপত্তি হয়—যখন কেবল কারণ হইতেই কার্য্যোৎপত্তি হয়, এবং ধ্বংশকালে তাহা কারণেই বিলীন হয়, তখন প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই ব্যক্ত বা পরিদৃশ্যমান জগতের অবশ্যই অব্যক্ত কারণ আছে। এই অব্যক্ত কারণ ত্রিগুণসম্পন্ন বলিয়া তাহাদের পরস্পর সম্মিলনে এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হয়। এবং এই ত্রিগুণ জন্যই পদার্থ সকল নানারূপ হইয়াছে।

সাংখ্যমতে পুরুষেরও অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ। কারণ, অন্যের জন্যই পদার্থের সংযোগ (Creation) সম্ভব। আর প্রকৃতিতে পুরুষের অধিষ্ঠান আছে, নতুবা প্রকৃতি হইতে স্বতঃ সৃষ্টি সম্ভব নহে। আর এক কথা, সাংখ্যকার বলেন, যখন সকল পদার্থই ত্রিগুণবিশিষ্ট, তখন তাহার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত অন্য কিছু পদার্থ আছে। সাংখ্যমতে এই পুরুষ বা আত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করে এবং মুক্তির জন্য চেষ্টা করে। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে এই বোধ হয় যে, সাংখ্যমতে পুরুষ এক, সাংখ্য-পণ্ডিতগণই এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন; তবে এই বহুরূপ জগতের সংশ্রবে তাহা বহুরূপ প্রতীয়মান হয়। জন্ম মৃত্যু জন্য, আমাদের ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব জন্য, এক সময়েই বিভিন্ন লোকের মনে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় বলিয়া ও ত্রিগুণের বিভিন্নতা জন্য পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, প্রকৃতির যাহা ধর্ম্ম, পুরুষের ধর্ম্ম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই জগৎ সম্বন্ধে পুরুষ কেবল সাক্ষীস্বরূপ, নির্লিপ্ত, অকর্ত্তা, মধ্যস্থ ও দ্রষ্টা। পুরুষের সহিত সংযোগ জন্য অচেতন প্রকৃতিকে চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়, এবং গুণের কর্তৃত্ব জন্য উদাসীন পুরুষকেও কর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়। পুরুষের ভোগের জন্যই ও কৈবল্য জন্যই পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হয় এবং ইহা হইতেই সৃষ্টি হয়।

যে ত্রিগুণের কথা লেখা হইল, সাংখ্যকার তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার মতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতির এই তিনগুণ বা এই তিনশক্তি; ইহারা যথাক্রমে সুখাত্মক, দুঃখাত্মক ও মোহাত্মক। সত্ত্ব-

শক্তি প্রকাশ করে,রজঃশক্তি ক্রিয়া বা গতি উৎপন্ন করে, আর তমঃ শক্তি আবরণ করে বা গতি ও ক্রিয়া বন্ধ করে। ফরাসী-পণ্ডিত ল্যাসেঁ ইহার নাম করণ করিয়াছেন,—Essentia (Essence বা Spirit), Impetus (Energy), Caligo (Inertia). ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, আশ্রয় করে, উৎপন্ন করে, এবং একটী অপরটীর সহিত ক্রীড়া করে। সত্ত্বগুণ, লঘু ও প্রকাশভাব; রজঃগুণ,উত্তেজক ও চঞ্চলতাকারী; তমঃগুণ, গুরু ও আবরণকারী। পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম, তৈল সলিতা ও অগ্নি সংযোগে প্রদীপের ন্যায়, এই গুণ গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও, তাহারা একত্র কার্য্য করে। এই ত্রিগুণ হইতে, ব্যক্ত প্রকৃতির অবিবেকাদি ধর্ম্ম জন্মে। এবং কার্য্য কারণের গুণাত্মক বলিয়া এই ব্যক্ত প্রকৃতির ত্রিগুণভাব হইতে, অব্যক্ত প্রকৃতিও যে ত্রিগুণসম্পন্ন, তাহা সিদ্ধ হয়, এবং যে (পুরুষ) ত্রিগুণাত্মক নহে, তাহা যে ইহার বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

তৎপরে সাঙ্খ্যকার মূলপ্রকৃতি হইতে পুরুষের সান্নিধ্যে কিরূপে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে মূল প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহান উৎপত্তি হয়। তৎপরেই এই মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উদ্ভূত হয়।* এই অহঙ্কারের যোড়শ পরিণাম হয়,তন্মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পাঁচ স্থূল ভূত সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার মধ্যে সত্ত্ব গুণাধিক্যে, কেহ শান্ত, রজো গুণাধিক্যে কেহ ঘোর, আর তমোগুণাধিক্যে কেহ জড়বৎ।

আমাদের সকলের যে বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহা এই মহানের অংশ মাত্র। ইহা জগত্ ব্যাপ্ত এবং সাংখ্য-পণ্ডিতদের মতে প্রকৃত জগত্স্রষ্টা বা ঈশ্বর। ইহার যে অংশ আমাদের মধ্যে আছে, তাহাই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাই আমাদের অধ্যবসায়। আমাদের জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণগুলি এই মহত্ত্বের ফল। এবং ইহার বিপরীত গুণগুলি তামসিক।

আমরা পূর্ব্বে মহত্তত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়, বলিয়াছি, সাঙ্খ্যকার বলেন, সেই অহঙ্কার অভিমানাত্মক। ইহা হইতে দুইরূপ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমত ইহার রাজসিক অংশে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়;—সাত্ত্বিক অংশে মন,আর সর্ব্বশেষে পঞ্চ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র তামস ও তৈজস (রাজসিক) উভয়বিধ অহঙ্কার হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, ইহারাই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—আর বাক্ organs of speech পানি, পায়ু, পাশ ও উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। রাজসিক অহঙ্কার হইতে এই দশ ইন্দ্রিয় শক্তি প্রথমে সৃষ্টি হয়। মন, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক (বা সমধর্ম্মী)। বাস্তবিক মন ইন্দ্রিয়গণের সমধর্ম্মী বলিয়াই তাহাদের সংকল্পক (বা পরিচালক হয়)। যেমন ত্রিগুণের ভেদে বাহ্যপদার্থ সকল নানা প্রকার, সেইরূপ মনও নানারূপ অবস্থাত্মক হয়। সাঙ্খ্যকার এই দশ ইন্দ্রিয়কে সমষ্টি ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন—এবং পরবর্ত্তী সাংখ্যপণ্ডিতগণ ইহাদিগকে এক একটী দেবতা বলিয়াছেন।

* এই বিষয়ের যাঁহারা সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যার নবজীবনে লিঙ্গ ও সৃষ্টি প্রবন্ধ দেখিবেন।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের শব্দাদি আলোচনা (প্রত্যক্ষ) মাত্রই আমাদের বৃত্তি উত্তেজিত হয়—(ক্রিয়া করে) আর বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ ইহাই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি।

আমরা এই স্থলে বলিয়া রাখি যে, সাঙ্খ্যকারিককার জগৎসৃষ্টি দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। সাঙ্খ্য-প্রবচনেই ইহার সবিস্তার বিবরণ আছে। পূর্ব্বে যে সৃষ্টি প্রকরণ উল্লেখ করা হইল, তাহা ব্যষ্টি বা individual সৃষ্টিসম্বন্ধে। এইটুকু কারিকাকারের খাঁটি মনোবিজ্ঞান। কিরূপে আত্মা প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হয়—কিরূপে তাহার সন্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে বিকার আরম্ভ হইয়া—তাহা হইতে প্রথমে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয়, দশ তন্মাত্র গুলি সৃষ্ট হইয়া প্রথমে শরীর সংগঠিত হয়—কিরূপে এই সূক্ষ্ম শরীর, মাতা পিতৃজ স্থূল শরীরের সহিত একত্রিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে—কিরূপে এই সূক্ষ্ম শরীর, যত দিন আত্মার মুক্তি না হয়—প্রকৃতির সহিত অত্যন্ত বিচ্ছেদ না হয়—ততদিন (অথবা প্রলয় কাল পর্য্যন্ত) বর্ত্তমান থাকে,—এই সকল তত্ত্ব দেখাইয়াছেন।

মূল সাংখ্য সূত্রেও এইরূপ ব্যষ্টি (বা individual) সৃষ্টি দেখাইয়া তাহা হইতে (generalisation দ্বারা) সমষ্টি সৃষ্টি (বা universal creation) অনুমান দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে কারিকামতে ব্যষ্টি সৃষ্টির কথাই উল্লেখ করিব। তবে এঁথয়ে সাংখ্যকারের জগত-সৃষ্টির প্রক্রিয়ারও আভাস দিলাম। বাস্তবিক সংখ্যশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ধরিলে সমষ্টি সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখানের তত আবশ্যক নাই, কেবল ব্যষ্টি সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিলেই দুঃখ নিবৃত্তি বা মোক্ষের উপায় বুঝিতে পারা যায়।

সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়াছি। দেখাইয়াছি যে, বুদ্ধির বিশেষ ধর্ম্ম অধ্যবসায় (intellect), অহঙ্কারের বিশেষ ধর্ম্ম অভিমান (feeling), আর মনের বিশেষ ধর্ম্ম সঙ্কল্প (willing), এই বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, আর দশটী ইন্দ্রিয়, এই ত্রয়োদশটীকে করণ বলে। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, সাংখ্য-মতে, এই ত্রয়োদশ করণের সাধারণ ধর্ম্ম।

এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কি, তাহা বিশেষ রূপে বুঝা যায় না। যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যে প্রাণ যখন সকলের পরিচালক, তখন ইহাকে আমরা Feeling of respiration (vitality ও) বলিতে পারি। অপান বায়ুকে Feeling of secretion, সমানবায়ুকে sensation of Digestion or of alimentary canal, উদান বায়ুকে organic sensation of nerve, আর ব্যান বায়ুকে organic feelings of circulation and nutrition বলিতে পারি। বেন সাহেবের Mental Science এর প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন।

সাঙ্খ্যদর্শন মতে, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে, আমাদের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এবং দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটী যুগপৎ অথবা ক্রমেং উত্তেজিত হয়। কিন্তু অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে যদি আমাদের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তবে তাহার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। (স্পেন্সর সাহেবের representative faculty কতকটা এই-

জন্য।) করণগুলি এইরূপ পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী ক্রিয়া উৎপন্ন করে। ইহারা আত্মার জন্যই কার্য্য করে, নতুবা আর কেহ তাহাদিগকে উত্তেজিত করে না।

এই করণগুলি প্রথমত আহরণ করে (perception) তৎপরে ধারণ করে (sensation) এবং শেষে প্রকাশ করে (consciousness) সাংখ্যকার বলেন, এই করণগুলির কার্য্য দশ প্রকার, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচ, আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পাঁচ। তবে ইহার মধ্যে কতকগুলি হার্য্য, কতকগুলি ধার্য্য, আর কতকগুলি প্রকাশক। (কেহ কেহ বলেন, আহরণ বলিলে "application of an organ to the object to which it is adapted" এই কথা বুঝায়, আর ধারণ করা বলিলে আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বুঝায়, অথবা অন্তঃকরণ বৃত্তির ক্রিয়া বা প্রাণ সংরক্ষণী ক্রিয়া বুঝায়।)

এক্ষণে বুঝা গেল যে, সাংখ্যমতে অন্তঃকরণ mind ত্রিবিধ ;—বুদ্ধি intellect, অহঙ্কার feeling, আর মন willing। আর বাহ্য বৃত্তি দশটী, তাহারাই পদার্থ সকলকে জ্ঞাপন করে (সেই জন্য তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়) ; বর্ত্তমান কাল লইয়া বাহ্যবৃত্তি—আর ত্রিকাল লইয়াই অন্তঃকরণ। সাংখ্যকার বলেন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থূল পদার্থ সকলই গ্রহণ করে, তবে কোন কোন অবস্থায় (যোগ অবস্থায় বা উচ্চতর দেবতার পক্ষে) তাহারা সূক্ষ্ম পদার্থও গ্রহণ করিতে পারে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাকের (organ of speech) বিষয় কেবল শব্দ। অপর চারি কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ ভৌতিক সমুদায় স্থূল বিষয়ই গ্রহণ করে।

সাংখ্যমতে বুদ্ধি প্রভৃতি তিন অন্তঃকরণই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিবার মূল কারণ। এই জন্য তিনটীকেই প্রকৃত করণ বলে, দশটী ইন্দ্রিয়কে কেবল ইহাদের দ্বার বলা যায় মাত্র। এই ত্রয়োদশ করণ পরস্পর বিভিন্ন, ইহারা ত্রিগুণ হইতে জাত, অথচ প্রদীপের ন্যায় বিষয় সকল প্রকাশ করে। ইহারা পুরুষেরই জন্য সমস্ত প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে প্রেরণ করে, আর বুদ্ধিস্থ হইলেই পুরুষের তাহা উপলব্ধি হয়। সাংখ্যমতে যে বুদ্ধি হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ পুরুষ উপভোগ করে—সেই বুদ্ধি হইতেই মূল প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ অবগত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে যতদূর দেখান হইল, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্রের মনোবিজ্ঞান। যতদূর দেখা গেল, তাহাতে এই বুঝা যায় যে, সাংখ্যকার অতি সংক্ষেপে, অল্প কথায় মনোবিজ্ঞানের প্রায় সমুদায় মূল সূত্রগুলিই দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে আমরা এ বিষয় অধিক বিশদ করিয়া দেখাইতে পারিলাম না।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, শরীর সাধারণত তিন প্রকার, এক সূক্ষ্ম শরীর (ইহা পুরুষের সান্নিধ্যে ত্রয়োদশ করণ আর পঞ্চতন্মাত্রে গঠিত) এই জন্য ইহাকে কেহ কেহ তন্মাত্রিক শরীরও বলে। আর এক মাতা পিতৃজ শরীর, ইহাই সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীর সহ সংযুক্ত করে। আর তৃতীয় স্থূল শরীর, ইহা পঞ্চ ভৌতিক (সাংখ্যপ্রবচনে ইহা একভৌতিক ক্ষিতিভূত হইতে জাত) ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর স্থায়ী, আর স্থূল শরীর অস্থায়ী (সাংখ্যমতে এই সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টির প্রথমেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা সঙ্গ রহিত, স্বাধীনভাবে বিচরণ

ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি দ্বারাই পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বন্ধন হয়। আর পুরুষ ইহা তাহার নিজের বন্ধন বিবেচনা করে। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই কেবল মুক্তি হইতে পারে।

ইহার জন্য বিচার, শ্রবণ, অধ্যয়ন, সুহৃদপ্রাপ্তি, দান প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন, ইহাই জ্ঞানের প্রধান উপকরণ। সাঙ্খ্যকার বলেন যে, তাহার পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে এই শ্রেষ্ঠজ্ঞান উৎপন্ন হইবে যে,—"আমি কেহ নহে, আমার কেহ নহে, ও আমার অস্তিত্ব নাই।" এক-কথায় আমাদের প্রকৃতিজ অহং জ্ঞান দূর হইলে, প্রকৃতির সহিত আত্মার বন্ধন ঘুচিবে ও আত্মার মুক্তি হইবে। সাঙ্খ্যকার বলেন, আত্মা এইরূপে প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হইলে, প্রকৃতি আপনিই আত্মাকে পরিত্যাগ করিবে—তখন ধর্ম্মাধর্ম্মের কিছুই ফল হইবে না। সাঙ্খ্যকার, আত্মার এই অবস্থায় প্রকৃতি তাহাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে বিষয়ের এখানে আর অবতারণা করিলাম না।

আমরা এতক্ষণ সাংখ্যদর্শনের সার মর্ম্ম উল্লেখ করিলাম। যে সাংখ্যজ্ঞানকে প্রাচীন আর্য্য-ঋষিরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থূল স্থূল অংশ আমরা এস্থলে দেখাইলাম। সাংখ্য শাস্ত্রনিক্ত এই জ্ঞান যাহার হইবে, সেই মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু সহজে এ জ্ঞান হওয়ার সম্ভব নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, এই প্রকৃতি চারি প্রকার অবস্থা, বিশেষ (ব্যক্ত), অবিশেষ (অব্যক্ত), লিঙ্গ (কারণে লীন) এবং অলিঙ্গ (মূল প্রকৃতি ভাব)। ইহার মধ্যে বিশেষ অবস্থা আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অনেক বিঘ্ন আছে। ইহা ব্যতীত প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থা উপলব্ধির উপায় কি? বলিয়াছি ত, প্রকৃতির স্বরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি না করিলে ত মুক্তি নাই। সাংখ্যকার বলেন, এই অব্যক্ত প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করিবার উপায়, যোগ। যেমন যুক্তি বলে পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অনুমান করিতে পারিব, সেইরূপ যোগবলে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। এইরূপে নির্ব্বিকল্পভাবে যোগযুক্ত হইয়া প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করিলেই তাহার সহিত আত্মা বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে এবং তাহা হইলেই মুক্তি হইবে।

অতএব সাংখ্যশাস্ত্রে প্রথমত ত্রিখত্রয় নিবৃত্তি বা মুক্তির উপায় স্থির করিতে গিয়া যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এই।

(১) কিরূপ যুক্তি বা তর্ক শাস্ত্র (method of reasoning or Logic) অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব স্থির করিবেন, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) তৎপরে এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল সত্য (axioms) ধরিয়া লইয়াছেন।

(৩) তৃতীয়ত, তিনি উল্লিখিত যুক্তিবলে এই ব্যক্ত জগতের মূলে, (underlying) যে অব্যক্ত জগত আছে তাহাই দেখাইলেন, তাহার গুণ কি, তাহার কার্য্য কি, ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম্ম কি, তাহা স্থিরীকৃত করিয়াছেন।

(৪) তৎপরে তিনি, অব্যক্ত জগত কেন যুক্তিসিদ্ধ, তাহা দেখাইয়াছেন, পুরুষের অস্তিত্বও যুক্তি সম্মত এবং পুরুষের ধর্ম্ম কি, তাহাও দেখান হইয়াছে।

(৫) এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগত যে ত্রিগুণাত্মক,সেই ত্রিগুণের স্বরূপ ও ধর্ম্ম কি, তাহা স্থির করা হইয়াছে।

(৬) অব্যক্ত জগত হইতে কিরূপে ব্যক্ত জগত সৃষ্টি হইল, তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

(৭) তৎপরে সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান। সংক্ষিপ্ত সূত্র পুস্তকে যত দূর সম্ভব, এই মনোবিজ্ঞান বেশ বিশদরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(৮) তৎপরে শরীর বিজ্ঞান—স্থূলশরীর, সূক্ষ্ম শরীর বিচার,—জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতি তত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে।

(৯) সর্ব্বশেষে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। সে জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, কিরূপে মুক্তি হয়, তাহা বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে।

সাংখ্যের এতগুলি তত্ত্ব বিশদ করিয়া বুঝান সহজ নহে। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কারিকা অবলম্বনে তাহা নির্দ্দেশ করিলাম মাত্র। মূল সাংখ্যসূত্রের যুক্তি অনেক সময়ে জটিল—অনেক সময় সামান্ত বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে, সাংখ্যদর্শন আপাততঃ অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; বিশেষত সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে যে মূলানুসন্ধায়ী বা *a priori* যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা এই উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সময়ে বিশেষ আদৃত হয় না, বা বিশেষরূপে বুঝা যায় না। আর এক কথা, আধুনিক বিজ্ঞান পড়িয়া জড়বাদ আমাদের হাড়ে হাড়ে বিন্ধিয়াছে, আমরা পরিদৃশ্যমান জড় জগতের বাহিরে যে আর কিছু আছে,তাহা একেবারে ধারণা করিতে পারি না,—যে যুক্তিতে তাহার সিদ্ধান্ত সম্ভব, তাহা অসার মনে করি; কাজে কাজেই আমরা প্রকৃত পক্ষে সাংখ্য প্রভৃতি প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র বুঝিবার অধিকারী নহি। তবে যে বিজ্ঞান আমাদিগকে জড়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী করিয়াছে,সেই বিজ্ঞানই যত অধিক বুঝা যাইবে, ততই আমাদের জড়বাদ দূর হইবে—জড়ের কারণ রূপে যে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে,—যে অব্যক্ত জগত লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। তখন সাংখ্য প্রভৃতি প্রাচীন দর্শনের যুক্তি বুঝিব,তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহার আদর করিতে শিখিব।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

শেষে অশ্রু ঝরিল।*

১

রণ-হত পতি-দেহ গৃহে ফিরি আনিল;
না ঝরে নয়ন, না সরে বচন;—
সে ভাব নিরখি সহচরীগণ,
"রোদন অথবা নিশ্চয় মরণ,"
সবে কাণাকাণি করিল।

* After Tennyson's Song—"Home they brought her warrior dead—" Vide the Princess, Beginning of canto VI.

২

বীরের যতেক গুণ ধীরে ধীরে গাহিল ;
বলিল, রমণী হৃদয়ের সার,
প্রকৃত বান্ধব, অরাতি উদার ;
শরীর নিষ্পন্দ, মুখেতে বালার
বচন না তবু সরিল।

৩

সখি এক ধীরি ধীরি নিজস্থান তাজিল ;
মৃত্যু শয্যাপাশে করিয়া গমন,
চকিতে খুলিল মুখ-আবরণ,—
শরীরে বালার না হল স্পন্দন,
নয়ন না তবু ঝরিল।

৪

নবতি বর্ষের ধাত্রী বীর শিশু লইয়া,
বসাল শিশুরে কোলে বিধবার ;—
ছুটিল নয়ন, বরষা-আসার,
ফুটিল বচন,—"বাছারে আমার
বাঁচিব তোমার লাগিয়া!"

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সন্ধিস্থলে।

দুটী বস্তু যে স্থানে মিলিত হয়, তাহাকে সন্ধিস্থল কহে। এই মিলনের স্থান অতি উপাদেয় বস্তু। সংসার-মরুর ওয়েসিস, বিপদ-সাগরের আশা-তরী, উষ্ণ পৃথিবীর শীতল বট-ছায়া,—এই মিলনের স্থান। তোমার হৃদয় অতি কঠোর হইয়াছে,—বিজ্ঞান দর্শনের কূট প্রশ্নের জটিল তত্ত্ব মীমাংসায় মস্তিষ্ক বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে,—সোণার বর্ণ কালিমাময় হইয়া গিয়াছে? ভাই, ক্ষণকাল কোন এক পর্ব্বতের উচ্চস্থানে আরোহণ কর,—দেখ, চতুর্দ্দিকে কেবলই পাহাড়ের কোলে পাহাড় উদাসীনত্ব প্রচার করিতেছে, বৃক্ষের পশ্চাতে বৃক্ষ সোঁ সোঁ রবে দুলিতেছে, ঝরণার গায়ে ঝরণা বহিয়া, কুল কুল রবে, কোথাও বা গভীর গর্জ্জনে উপলখণ্ড সকলকে অবহেলা করিয়া তীরবেগে ছুটিতেছে ;—তাহারই নিকটে বৃক্ষে বসিয়া কত কত পাখী, অতি মধুর স্বরে, মধুর ঝঙ্কারে পাহাড়ের নিস্তব্ধতাকে ভেদ করিয়া, আকাশ ভাসাইয়া কি স্নিগ্ধকর অমৃত ঢালিতেছে ;—চাহিয়া দেখ, এই মধুময় স্থানে, অনন্তগগন-পথকে অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বত শোভাকে তুচ্ছ করিয়া, দেহকে আরক্তিম করিয়া, ঐ বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া সূর্য্যদেব অস্তমিত হইতেছেন। উজ্জ্বল সোণার রং ক্রমেই কালিমাময় হইতেছে,—উষ্ণত্ব, উজ্জ্বলত্ব কমিয়া যাইতেছে, অমনি দূরবর্ত্তী পাহাড়ের অঙ্গ শোকে যেন বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছে,—সকল শোভা নিমেষের মধ্যে আঁধারময় হইয়া আসিতেছে! আলোক আর আঁধার, আনন্দ আর ভয়, উৎসাহ আর বিষাদ,—আসক্তি আর বৈরাগ্য,—দিবস আর রজনী, একস্থানে মিলিয়াছে!!—এই মহা সন্ধিস্থলে দাড়াইয়া একবার বলত, ঐ মিলন উপাদেয় কিনা, হৃদয়-প্রফুল্লকর কিনা? দেখিতে দেখিতে এ ভীতিমাখা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পাখী সব কুলায় ছাড়িয়া, গগন ছাইয়া, মেঘের কোলে চড়িয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছে,—পশু সকল ত্রস্তব্যস্ত হইতেছে,—মেঘ সকল দ্রুত চলিয়া বিদ্যুৎ ঢালিয়া পাহাড়ের গায়ে আশ্রয় লইতেছে,—ঝরণা হইতে অবিরত বাষ্প উঠিয়া, দিক ডুবাইয়া, আনন্দোৎসবে মত্ত হইতেছে,—যোগাশ্রমে শঙ্খ

ঘণ্টা উচ্চরবে বাজিতেছে,—নরনারী মিলিত কণ্ঠে যোগেশ্বরের গুণ গাইতেছে,—কি আনন্দ, কি মহোৎসব, কি স্বর্গের ছবি ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছে! মানুষ এ ছবি দেখিয়া, শুষ্কত্ব, কঠোরত্ব, নিরাশত্বকে হৃদয় হইতে খুলিয়া রাখিয়া,—অবিশ্বাস, অপ্রেম, অভক্তি,—রিপুর জ্বালা,—সংসারের বিপদ-জালকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া, ভক্তি-গদ-গদ চিত্তে এই মহোৎসবে ক্ষণকালের জন্য যোগ দিয়া কৃতার্থ হইতেছে!! সান্ধ্য-গগন তলে, সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিয়া, এমন কোন্ পাষণ্ড পৃথিবীতে আছে, যে বক্ষস্ফীত করিয়া বলিতে পারে, আমার হৃদয়ে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, মন আনন্দে মাতে নাই,—জীবন সুখময় বলিয়া বোধ নাই?

আর একস্থানে এস। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মপুত্র উৎসরিত হইয়া জীবনলীলা খেলিতেছে,—কত দেশের মলিনতা বিধৌত করিতেছে, কত মেঘ-পরিত্যক্ত বারি-রাশি বা পাহাড়-চ্যুত ঝরণা-রাশিকে প্রশস্ত উদার কোল পাতিয়া স্থান দিতেছে,—কি মধুর প্রেমের খেলা খেলিতেছে; কত চাঁদের কিরণ ধরিতেছে,—কত ভাব-তরঙ্গ তুলিয়া হাসিতেছে, নাচিতেছে, আর চলিতেছে। চলিতে চলিতে,—দূর দেশ হইতে আগত, প্রেম-বিহ্বল, গঙ্গা-যমুনার যুগীভূত মিলন,—উত্তাল তরঙ্গময়ী, উন্মত্ত, পদ্মার সহিত যখনই সাক্ষাৎ হইল, অমনি কোলে কোল মিলাইয়া, হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া,—জীবন মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, দুই এক হইয়া গেল;—ভ্রাতা ভগ্নীর এমন ঘনিষ্ঠ মিলন আর কে কবে দেখিয়াছে? উন্মত্তভাবে উন্মত্ততার মিশিল, প্রশস্ত হৃদয় আরও প্রশস্ততর হইল,—মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে মায়াময়ী পদ্মা, পূর্ব্বস্থকে কৃতার্থ করিয়া, ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধরিয়া ছুটিতে লাগিল। বাধার উপরে বাধা, বিঘ্নের উপরে বিঘ্ন, বিপদের উপরে বিপদ, সকল অতিক্রম করিয়া, গভীর গর্জ্জনে সকলকে ভীত করিয়া, শেষে মেঘনার কূলে যাইয়া, আপনাকে বিসর্জ্জন দিল। গভীরে গভীরতা, প্রশস্ত হৃদয়ে প্রশস্ততা, উন্মত্ততাতে উন্মত্ততা মিলিয়া মিশিয়া সেখানে যে কি মহাশক্তি সংগঠিত হইল, যে কখনও দেখে নাই, তাহাকে বুঝান যায় না। জীবনে জীবন ঢালিয়া, হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া যে কি সুখ, আমাদের ন্যায় লোকেরা তাহা কি বুঝিবে? একতা-বিহীন, সম্প্রদায়-প্লাবিত, ব্যক্তিত্ব-পূজিত, অহং-জ্ঞান-গর্ব্বিত ভারতের নব্যসম্প্রদায় তাহা কি বুঝিবে? ব্রহ্মপুত্র, হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া, আপনার অস্তিত্বকে ডুবাইয়া, গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য ভ্রাতা ভগ্নীর কোলে ডুবিয়া, অলক্ষিত ভাবে, অনন্ত মহাসিন্ধুতে মিলিতে চলিল!! সেরূপ দেখিয়া জগৎ মোহিত, সে ভাব দেখিয়া সংসার বিস্মিত! সকল মায়া, সকল মোহ অতিক্রম করিয়া, শেষে মহাসাগর-কূলে উপস্থিত হইল। ক্ষুদ্র আর মহান, সসীম আর অসীম, সঙ্কীর্ণ আর উদার, সংখ্যা-জ্ঞাপক আলোক আর বিশেষত্ব-নাশক আঁধার, যেখানে একত্রে মিলিত হইতেছে, সে স্থানের বর্ণনা আর আমরা কি করিব! সীমা অসীমে মিশিতেছে, ক্ষুদ্র অনন্তে ডুবিতেছে, জীবন-মায়া বিসর্জ্জিত হইতেছে যেখানে, আমরা মায়া মোহের দাস, সে মহাসন্ধি-স্থলের ব্যাখ্যা আর কি করিব!! কূল ছাড়িয়া ব্রহ্মপুত্র অকূলে দেহ ঢালিতেছে,

—আসক্তি ছাড়িয়া মহা বৈরাগ্যে মজিতেছে—রূপ বিসর্জ্জন দিয়া অরূপে মিশিতেছে—আলোক ত্যজিয়া মহা আঁধারে ডুবিতেছে। কি সৌন্দর্য্য, কি অপরূপ চিত্র, কি স্বর্গের ছবি! মৃত্যুকে ভয় করি, তুমি আর আমি; যে মরিতেছে, সে ভয় করে না। মহাসন্ধিস্থলে যখন মানুষ দণ্ডায়মান হয়,—শরীরের সহিত আসক্তি, মায়া, মোহ, রূপ গন্ধ, জ্বালা যন্ত্রণা, পাপ তাপ, যখন সকল নির্ব্বাপিত হইতে থাকে, তখন মানুষ যে তৃপ্তিকর সুখে, যে মনোমোহন শান্তিতে নিমগ্ন হয়; সন্দেহবাদী, অবিশ্বাসী আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। আমরা বুঝি আর না বুঝি, জানি আর না জানি, ঐ পথেই চলিয়াছি; জীবন তরী বিপদ-মেঘনায় ডুবিবে বলিয়া ভয় করিতেছি না,—কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে, কোন্ অলক্ষিত শক্তির ইঙ্গিতে, কে জানে, সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া, অবিরত আমরা ঐ মহাসন্ধিস্থলকে লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছি। যদি সুখ শান্তির আশা না থাকে, তবে চলিয়াছি কেন, বলিতে পার?—তোমরা চলিতেছ কেন, বলিতে পার? বাস্তবিকই এমন সুখের স্থান আর নাই, তাই চলিতেছি। শিশু মরিয়া বালক হইতেছে, বালক মরিয়া যুবক সাজিতেছে, যুবক রূপ ডুবাইয়া বৃদ্ধ হইতেছে, বৃদ্ধ শেষে মায়া মোহ বা আসক্তিকে ডুবাইয়া অনন্তকাল-সাগরে মিশিতেছে। ব্রহ্মপুত্র পদ্মা হইতেছে, পদ্মা-মেঘনা রূপ ধরিয়া পরে মহাসমুদ্রে মিশিতেছে। সৃষ্টির মহত্ত্ব যে জন হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে, জীবন-মহাকাব্য যে জন একবার অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে এই গভীর ভীতি-সংযুক্ত মহাসন্ধি-স্থলের মহত্ত্ব, মহাকাব্য পাঠ করিয়া বিস্মিত, আনন্দ-বিহ্বল না হইয়াই থাকিতে পারে না। মহাসিন্ধুতে দেহ ঢালিতে আসিয়া যে ব্যক্তি চক্ষের জলে বক্ষ ভাসায়, সে ত অবিশ্বাসী মূর্খ; কিম্বা মহাসিন্ধুতে ব্রহ্মপুত্রকে কূলের মমতা ছিড়িয়া মিলিতে দেখিলে সে জন চক্ষের জল ফেলে, সে ত নরকের কীট,—মায়া মোহের অধীন, আসক্তির দাসানুদাস। মনুষ্যের বাহ্য-চক্ষুর ভিতরে যে অন্তর-চক্ষু বিদ্যমান রহিয়াছে,—দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়-শক্তি লুকায়িত আছে, এই মাটীর শরীরের মধ্যে যে বিবেক-তাড়িত চলিতেছে, তাহার সাহায্যে, যে এই মহাসন্ধিস্থলের মহত্ত্ব দেখিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে,—সন্ধিস্থল কি সুন্দর, কি হৃদয়-তৃপ্তিকর, কি মনোমোহন!

জীবনময় সন্ধিস্থল, ভুবনময় মিলনের শাস্ত্র। মিলনই লক্ষ্য, মিলনই গতি, মিলনই পরিণাম,—এই জীবনের, এই ভুবনের। কত ব্যাখ্যা করিব, কত কথা বলিব! কঠিন প্রস্তরে শীতল ঝরণা, শীতল মেঘেতে কঠিন বজ্র; কোমল কুসুমে তীক্ষ্ণ কণ্টক; সূর্য্যের প্রখর-দীপ্তিময় বুকে রজনীর আঁধার, চন্দ্রের স্নিগ্ধতাতে রূপ-কলঙ্ক;—কঠিন পুরুষের হৃদয়ে কোমল নারীর হৃদয়;—সুখে দুঃখ;—বিপদে সম্পদ; উৎসাহে বাধা; পাপে পুণ্য; হৃদয়ে শরীর; উদারতায় সঙ্কীর্ণতা;—বৈরাগ্যে আসক্তি; ধর্ম্মে অধর্ম্ম; আলোকে আঁধার, এ সকল মিলনে কি স্বর্গের শোভা বিদ্যমান, সঙ্কীর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া, চক্ষু খুলিয়া যে একবার দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। আধ হাসি আধ কান্না;—আধ প্রেম আধ জ্ঞান;—আধ মোহ আধ মুক্তি,—

—এইরূপ মিলনের স্থান কি এক উপাদেয় বস্তু!!

এই যে সন্ধিস্থলের মাহাত্ম্য এতক্ষণ ধরিয়া ক্ষীণ ভাষায় কীর্ত্তন করিলাম,—এই সন্ধিস্থল জীবনময়, ভুবনময়। অণুতে অণুতে সন্ধি, জড়ে জড়ে সন্ধি, জীবে জীবে সন্ধি, মানুষে মানুষে সন্ধি। মিলনের জন্য জগৎ চির-লোলুপ। দুটী বর্ণ মিলিয়া এক হইতেছে, দুটী নদী মিলিতেছে, দুটী পুষ্পের অণু সম্মিলিত হইতেছে, দুটী হৃদয় মিশিতেছে, দুটী দেশ বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া মিলিতেছে, দুটী জাতি যুদ্ধ বিগ্রহ মিটাইয়া সন্ধির জন্য লালায়িত হইতেছে; দুটী সম্প্রদায় মত-পার্থক্যকে ভুলিয়া, ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া এক হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিচ্ছেদ, অমিলন, পৃথিবীর বড়ই অসহ্য। স্বামী স্ত্রীর মন-মানিনো বা ঝগড়া বিবাদে পৃথিবীর বায়ু দুষিত হইতেছে, কিন্তু কোন্ মানুষ এমন আছেন, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, রমণীর সহিত মিলিত হইতে যাহার বিতৃষ্ণা বা অনিচ্ছা জন্মিয়াছে? তোমাতে আমাতে কত বিবাদ, মতের পার্থক্য হেতু কত অসদ্ভাব, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে ডুবিয়া অনুসন্ধান কর, বুঝিবে, আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য তোমার হৃদয়ের এক গভীর তৃষ্ণা রহিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা, পৃথিবীর এই মিলনের প্রবল বাসনাকে অনেক মলিন করিয়া ফেলিয়াছে বটে; পৃথিবীর প্রভুত্ব-লাভ-ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, দেশে দেশে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া মিলনের গভীর বাসনাকে অনেকাংশে বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে বটে; কিন্তু স্থির ভাবে অনুসন্ধান কর, পরীক্ষা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে,—এখনও মিলনের জন্য কেমন এক স্বর্গীয়-ভাব নরনারীর শোণিতের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। প্রত্যেক নরনারীর মুখে বা হৃদয়ে, পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুতে এমন এক স্বর্গীয় জিনিষ, এমন এক আশ্চর্য্য অমৃত-ভাণ্ডার, এমন এক বিশেষত্ব নিহিত রহিয়াছে, যাহার মমতায় মানুষ মানুষের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত। যে জন মিলনের এই প্রবল বাসনার মুখে জাতি-বিদ্বেষ-ভস্ম ঢালিতে প্রয়াসী, তাহার ন্যায় পৃথিবীর শত্রু আর নাই। সৃষ্টির গূঢ় রহস্যই যেন,—মিলন। প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক জীবেই এই জন্য, বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। বিশেষত্ব লাভের জন্য, পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য চির-লোলুপ। বিশেষত্ব লাভের জন্য মানুষ এতই উৎকণ্ঠিত যে, চিরকাল কখনই এক অবস্থায় থাকিতে সে ভালবাসে না। যে দুঃখের কশাঘাতে আমাদের ন্যায় দরিদ্রের অঙ্গ পেষিত হইয়া যাইতেছে, চির-সুখীজন সেই দুঃখকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই লালায়িত। চির-আলোক মানুষ সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই, প্রজ্বলিত দীপকে রাত্রে নির্ব্বাণ করিয়া রাখে। এক অবস্থা মানুষের কখনই ভাল লাগে না। বালক যুবক হইতে চায়। যুবক বৃদ্ধত্বের জন্য লালায়িত। দরিদ্র ধন চায়, ধনী দারিদ্র্যকে ভালবাসে। সুখে দুঃখ না মিলিলে, সুখ সুখই নয়। ধনের পার্শ্বে দারিদ্র্যের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ধ্বনিত না হইলে, ধনে কোন সুখই পাওয়া যায় না। নদীতে ভীতিযুক্ত তরঙ্গ না থাকিলে নদীর আদর হয় না,—অরণ্যে

হিংস্রজন্তু না থাকিলে অরণ্য ভাললাগে না ;—রজনীতে চন্দ্রের কুন্দকুসুমবৎ জ্যোতির কোলে আঁধার না ভাসিলে কখনও চন্দ্রমার আদর হইত না। এক অবস্থা, এক ভাব পৃথিবীর অসহ্য। তাই এত বিশেষত্বের সৃষ্টি। লালের পার্শ্বে নীল, নীলের কোলে শাদা, শাদার বুকে সবুজ, সবুজের ধারে কাল, কালোতে হলুদ মিলিয়া মিশিয়া কতই তৃপ্তি উৎপাদন করিতেছে। যদি পৃথিবীর সব একাকার হইত—বৃক্ষ লতা, চন্দ্র সূর্য্য, আলোক আঁধার, পর্ব্বত নদী, নরনারী, তুমি আমি,—বালক বৃদ্ধ, সকলই যদি একাকার হইত, পৃথিবীতে মিলনের এই যে গভীর শাস্ত্রের কথা বলিতেছি, এ শাস্ত্র থাকিত না ;—পৃথিবী নরনারীর বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত। ঈশ্বরের বিধান, মানুষ পৃথিবীতে বাস করিবে, তাই অবস্থার পরে নূতনতর অবস্থা আসিতেছে,—পৃথিবী যেন অনন্ত বৈচিত্র্যময় শোভায় সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষ মিলিতে মিলিতে, ক্রমাগত মহা-মিলনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অবস্থার পরে অবস্থা, লোকের পরে লোক, জাতির পরে জাতি, ক্রমেই আসিয়া মানুষের শূন্য বুককে আলিঙ্গন করিতেছে। দুঃখীর মনে যদি অবস্থার বৈপরিত্যের আশাময়ী অঙ্কুর না থাকিত, তবে দুঃখী কখনও জীবনভার বহিত না। ঘোরতর যুদ্ধের সময় উভয় দলের মনে যদি সন্ধির আশা না জাগিত, তবে কেহ দেহ বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধে রত হইত না। মানুষের জীবন উন্নতির দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইবে, এ বিশ্বাস যদি নরনারীর হৃদয়ে না থাকিত, মানুষ কখনও জীবন-সংগ্রামে রত হইতে পারিত না,—আত্মঘাতী হইয়া মরিত। যে দিকে দেখ, সর্ব্বত্রই মিলনের বিধান, সৃষ্টির সূক্ষ্ম স্থানে সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত। এই মিলনকে লক্ষ্য করিয়াই, মিলনকে ধরিয়াই মানুষ চলিতেছে। পৃথিবী হইতে মিলনের ভাব উঠিয়া যাইতেছে, যে মনে করে, সে মূর্খ ; কারণ মিলনের আশা না থাকিলে বিশ্বের কোন জীবসংখ্যার বৃদ্ধি হইত না। আমরা বুঝিতেছি, পৃথিবী সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত মিলনের দিকেই চলিতেছে! ভারতবর্ষ আর ইংলণ্ডের সহিত দশ শত বৎসর পূর্ব্বে যে সম্বন্ধ ছিল না, সে সম্বন্ধ আজ হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য পৃথিবীকে ক্রমাগত এক গভীর আত্মীয়তার দিকে,—এক অপরূপ মিলনের পথে লইয়া যাইতেছে। য়ুরোপ আসিয়া, আফ্রিকা আমেরিকা, আজ সকলেই মিলন, সকলেই ভ্রাতৃভাবের জন্য লালায়িত হইতেছে। আর্য্যভাবে পাশ্চাত্য ভাব মিশিতেছে,—শ্রীগৌরাঙ্গে আর মহম্মদে, শাক্যমুনি আর যিশুখ্রীষ্টের সহিত গভীর মিলনের ভাব দেখা যাইতেছে। ভারত কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ মূর্খ পণ্ডিত, তুমি তাহা কি বুঝিবে ? পৃথিবীর সকল দেশ উন্নতির জন্য, পরস্পরের বিশেষত্ব গ্রহণের জন্য উন্মত্ত হইয়া, কষ্ট যন্ত্রনাকে মাথায় বহিয়া দেশ দেশান্তরে যাইবে, আর ভারত চিরকাল একই ভাবে মরণের কোলে পড়িয়া রহিবে ? অসভ্য জাপানে উন্নতির সঙ্গীত ধরিয়াছে,—পর-পদ-দলিত ইটালীতে আবার দীপ্তিময়ী অবস্থা পরিবর্ত্তনের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতেছে,—অসভ্য রুসিয়া উন্নত মস্তকে রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে ছুটিতেছে, আর

সোণার ভারত চির অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে? বিধাতার বিধান কখনই তাহা হইতে পারে না। এক অবস্থার পীড়নে কখনই কোন জাতি চিরকাল পেষিত হইতে পারে না। তাই দেখ, দুঃখের পরে সুখ-সূর্য্য উদিত হইতেছে। ভারত যে এক অপরূপ সন্ধি-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, আজ আমরা তাহারই কথা বলিব। মরণের কোলে শুইয়া, ভারত যে এক জীবন্ত ভাব উপার্জ্জন করিতেছেন, আজ আমরা তাহারই কথা বলিব।

বহুকাল ধরিয়া ভারতে এই এক গভীর শাস্ত্র প্রচারিত হইতেছিল,—আপনাকে লইয়া মত্ত হও। "আপনি মানুষ হও, আপনি মহত্ব লাভ কর, আপনি যোগী হও, আপনি মুক্ত হও, সংসারসুখ, ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে গমন কর, যোগ সাধ-নায় অঙ্গ ঢালিয়া দেও,—নির্ব্বান মুক্তি লাভ করিয়া মোক্ষধামে চলিয়া যাও।" আর্য্য-ভূমিতে মহত্বের অভাব রহিল না, জ্ঞানকাণ্ড —বিজ্ঞান দর্শন; কর্ম্মকাণ্ড—যাগযজ্ঞাদি, সকলেরই উৎকর্ষ সাধিত হইল,—যোগ ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীর উজ্জ্বল স্বর্ণমুকুট ভারতের মস্তকে শোভিত হইল। কিন্তু অন্যের জন্য সে সকলের কিছুই হয় নাই, সুতরাং থাকিল না। ভারতের কীর্ত্তিকলাপ যে আজ বিস্মৃ-তির আঁধারে,—কল্পনার ক্রোড়ে শয়িত রহিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতের প্রাচীন যোগী ঋষিরা পরের জন্য ভাবিতেন না,—ভাবাকে ধর্ম্ম মনে করিতেন না। তুমি পাও আর না পাও, আমার মুক্তি হইলেই হইল। ভাব বুঝিয়া অনুসরণ করিতে হয়, কর, আমি কাহার জন্য ভাবিব না, আমি আমারই জন্য দায়ী, আমারই জন্য চিন্তা করিব, এই তখনকার অধিকাংশ মুনিঋষি-দিগের ধর্ম্ম-কথা। সংসার করা অধর্ম্ম, বিবাহ পাপ-কলঙ্ক,—পৃথিবীময় প্রলোভন,—লো-কের হৃদয় গরলময়,—তখনকার লোকেরা, কল্পনার চক্ষে ইহাই দেখিয়া ভীত হইয়া, সং-সার পরিত্যাগ করিয়া, বিজন অরণ্যে পলায়ন করিতেন। ভারতের কত মুনি, কত যোগী, কত ঋষির অস্তিত্ব-নাম হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে বিস্মৃতিতে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? তখনকার ভাবই এই—নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন কর—ফলের প্রত্যাশী হইও না,—অন্যের জন্য ভাবিও না, আপনি যোগী হও, আপনি ঋষি হও। যাহা কিছু ভজন সাধন, যাগযজ্ঞ, যোগধ্যান, সকলই নিজের জন্য কর। অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ,—ভারতের ভাবী উন্নতির মূলে এই প্রকারে কুঠারাঘাত করিল। এই যোগ ধর্ম্মের ভাব অত্যন্ত ঘনীভূত হইল অবশেষে—শাক্যমুনির সময়ে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যখন বিলাসস্পৃহা প্রবেশ করিতেছিল, যোগ ধর্ম্মের ভাব যখন একটু একটু শিথিল হইতেছিল, তখন শাক্যসিংহ রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। স্ত্রী জানি না, পুত্র জানি না, পিতা জানি না, মাতা জানি না, শাক্য এই সিদ্ধান্ত করিয়া, রাজ-ভবন পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনের পর সিদ্ধ হইলেন। মার পিশুনকে পরাজয় করিয়া শাক্য বুদ্ধ হইলেন,—নির্ব্বাণ মুক্তি পাইলেন। বুদ্ধের প্রতিকৃতি, বুদ্ধের ছায়া দেশ দেশান্তরে অমনি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল;—যোগ ধর্ম্মে আবার ভারত মাতিয়া উঠিল। ভার-তের নরনারী আবার আপনার জীবনকে উন্নত করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কি উন্নত ভাব! বাস্তবিক বুদ্ধের জীবনে এক

গভীর শিক্ষা এই পাওয়া যায়, আপনি সিদ্ধ না হইলে অন্যের জন্য কিছুই করা যায় না। যতক্ষণ আমি অন্ধ, ততক্ষণ আর একজন অন্ধকে কখনই আমি চালাইতে পারি না। আমার জীবন পবিত্র না হইলে কখনই অন্যকে আমি পবিত্রতার পথে টানিতে পারি না। আমার জীবন বিশ্বাসে অটল না হইলে, কখনই আমি অন্যকে বিশ্বাসে আকর্ষণ করিতে পারি না। ভারতের এই আত্মতত্ত্ব শিক্ষা,—এই সিদ্ধির কাব্য,—এই অহং-জ্ঞান বিসর্জ্জনের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত, বুদ্ধের সময়ে চরম উন্নতি লাভ করিল। দলে দলে পরিব্রাজকগণ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন;—ভারতের আকাশ আবার ধর্ম্ম বিপ্লবে মাতিয়া উঠিল। সকলেই মাতিয়া উঠিল, কেহ আর সংসারের উন্নতির দিকে চাহিল না। রাজা হও, আর প্রজা হও,—ধনী হও আর দরিদ্র হও, সাধনা ভিন্ন আর কাহারও পরিত্রাণের পথ নাই, এই মন্ত্র অনন্ত গম্ভীরস্বরে এক প্রান্তর হইতে ভারতের অপর প্রান্তর পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইল। কিন্তু রক্তমাংসধারী ভারত, হৃদয় ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, কেবল কঠোর পরমার্থ জ্ঞান লইয়া অধিক দিন থাকিতে পারিল না। আবার ভোগ বিলাস উপস্থিত হইল। আবার ব্রাহ্মণের আধিপত্য কিম্বা অলসতার পরিচর্য্যা আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য পুন স্থাপিত হইলে, সকল উন্নতি-লাভের ভার ব্রাহ্মণের উপর সমর্পণ করিয়া, ভারত আরো নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। অনেক যুগ এই ভাবে অতীত হইল। কিন্তু দুর্দ্দিন কি কখনও চিরস্থায়ী হয়? ভারতের আকাশ আবার পরিষ্কার হইল,—জ্ঞান কাণ্ডের পরে চৈতন্যের প্রেম কাণ্ড আরম্ভ হইল। প্রেমের অবতার অবতীর্ণ হইলেন। কোথায় হরি, কিরূপ হরি, কেমনে পাইব হরিকে, এই চিন্তায় উন্মত্ত। জ্ঞানহীন সন্ন্যাসীর দল চৈতন্যের সময়ে সৃষ্ট হইল। বুদ্ধ এবং চৈতন্য উভয়েরই মূলমন্ত্র সাম্যবাদ—ভেদাভেদ নাই, সকলেই ধর্ম্মের অধিকারী। কিন্তু এক জন জ্ঞানী, আর এক জন প্রেমিক। দলে দলে লোক আসিয়া চৈতন্যের হরিগুণ কীর্ত্তনের উন্মত্ততায় যোগ দিল,—সংসার পরিবার পরিত্যাগ করিয়া, ভেক লইয়া, ভিখারী হইয়া, বৈরাগীর দল বাহির হইল,—মূলমন্ত্র,"—নামে রুচি, জীবে দয়া।" সকলকে প্রেমালিঙ্গন কর, পাপী পুণ্যাত্মার ভেদাভেদ নাই, সকলের কর্ণেই হরিনাম শুনাও, সকলকে মাতাও, পরিবার পরিজন নাই,—আত্মীয় বান্ধব নাই; সকল একাকার হইয়া হরি প্রেমে মত্ত হও। চৈতন্যের গভীর প্রেমে লোক তখন মাতিল বটে, কিন্তু বুদ্ধের প্রেম-শূন্য জ্ঞান যে কারণে ভারতের মঙ্গল সাধন করিতে পারিল না, সেই কারণে চৈতন্যের জ্ঞান-শূন্য প্রেমও ভারতের সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হইল না। সন্ন্যাস ধর্ম্ম সকলের উপযোগী হইল না, ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায় মিশিয়া এক হইল না;—সাম্যে অসাম্য মিশিল। চৈতন্যের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক হইল না, ইহা বুঝিয়া, দয়ার অবতার সোণার চাঁদ অসময়ে অস্তমিত হইলেন। বুদ্ধের প্রেমশূন্য জ্ঞান, আর চৈতন্যের জ্ঞান-শূন্য ভক্তি উভয়ই যুদ্ধে পরাস্ত হইল,—ভারতের উদ্ধার হইল না। প্রেমের ভিতরে কি এক অভাব ছিল, যাহাতে প্রেম সময়ে অপ্রেম হইয়া গেল। প্রেমে কত মলিনতা—কত অপবিত্রতা—কত কি কলুষিত ভাব মিশিল।

হৃদয়-হীনত্ব প্রবেশ করিতেছে, তাহাদেরও সেই দশা ঘটিল। ঘোরতর ঘৃণা বিদ্বেষ উৎপন্ন হইল,—হিন্দু খ্রীষ্টানে আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল;—ভারতে এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হইল। ঘনীভূত মেঘে ভারত আবার আচ্ছন্ন হইল। এই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়—এই তিনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, তিনকে মিলাইয়া এক করিতে চেষ্টিত হইলেন। পৃথিবীর ধর্ম্মের সকল সত্য মিলিয়া এক হইবে,—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম মিলিলে তবে ভারত রক্ষা পাইবে,এই মহামন্ত্র সেই তমসাচ্ছন্ন দিনে তিনি গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করিলেন। সম্প্রদায় নাই,—ভেদাভেদ নাই,—হিংসা বিদ্বেষ নাই,—জ্ঞানী মূর্খের প্রভেদ নাই—সকলে এক সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান, প্রেম ও কর্ত্তব্যে মিলিত হইব; এই কথা তিনি প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তখনও সাম্প্রদায়িকরূপ ধারণ করে নাই;—উদার,—সার্ব্বভৌমিক,—ঘনীভূত মিলনের ধর্ম্ম তিনি প্রচার করিলেন। একে তিন, তিনে এক। জ্ঞান ভিন্ন প্রেম প্রেম নহে; প্রেম ভিন্ন জ্ঞান শুষ্ক, কর্ম্ম ভিন্ন প্রেম নাই;—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম ভিন্ন ব্রহ্ম নাই। বিধাতার কৃপায় এইরূপে ভারত এক আশ্চর্য্য সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। আজ শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ ভাব, বিশেষ স্রোত সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইতেছে;—'যুক্তি ভিন্ন শাস্ত্র মানি না; আবার শাস্ত্র মানি বলিয়াই যুক্তি মানি;—আবার যুক্তি মানি বলিয়াই কোন শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করি না;—কোন শাস্ত্রই অভ্রান্ত নহে বলিয়া বেদবেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ, সকলই সমান।' এইরূপে পাশ্চাত্য স্রোত, বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায়, ভারতের নরনারীর হৃদয় ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, কাহার সাধ্য ইহার দুর্দ্দম্য বেগকে প্রশমিত করে? দুঃখের কষাঘাত সহ্য করিয়া যে সুখ পায়, সে কি পুন দুঃখে পড়িতে চায়? অন্ধ যদি একবার চক্ষু পায়, তবে সে কি আবার অন্ধ হইতে বাসনা রাখে? শিক্ষার মাহাত্ম্য যে একবার বুঝে, সে কি পুন অশিক্ষিত হইতে চায়?—যুবক কি বালক হইতে চায়? ধনী কি চিরদরিদ্র হইতে চায়? জ্ঞানী কি মূর্খ হইতে ইচ্ছা করে? যে কঠোর অবস্থার হস্ত হইতে ভারত চলিয়া আসিয়াছে, শত সহস্র চেষ্টা কর, কাহারও সাধ্য নাই যে, ভারতকে আবার সেই প্রাচীন অবস্থায় লইয়া যাইবে। ব্রহ্মপুত্র পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে, মানুষ তোমার কি শক্তি আছে যে,তুমি পুন পদ্মা গঙ্গাকে গোমুখীতে, ব্রহ্মপুত্রকে 'ব্রহ্মকুণ্ডে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে? সকল শক্তি এখানে পরাস্ত। কাল্পনিক নিয়ম ধর্ম্ম আর ভারতে ফিরিবে না, পৌরাণিক (unpractical ?) কল্পনার ধর্ম্ম আর মাথা তুলিবে না;—বৈষ্ণব,—সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আর স্থান পাইবে না;—আর্য্য মিলিয়াছে—অনার্য্যের সহিত; জ্ঞান মিলিয়াছে—কর্ম্মের সহিত,—প্রেম মিলিয়াছে জ্ঞানের সহিত,—পূর্ব্ব পশ্চিম এক হইতেছে,—শাক্য, চৈতন্য, খ্রীষ্ট এক হইতেছেন;—এমন সুখের মিলন ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, সঙ্কীর্ণমনা, কর্ম্মশূন্য, ভক্তিশূন্য, জ্ঞানপিপাসু, তুমি? জাতিভেদের মূল ভারত-হৃদয় হইতে উৎপাটিত হইয়াছে,—সাধ্য কি তোমার যে তুমি পুন তাহাকে সঙ্কীর্ণতার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবে? বিধবার অশ্রু ঘুচিবে,—ভ্রূণহত্যা,—পাপ ব্যভিচার,—মদ মাংস,এসকল আর ভারতে

স্থান পাইবে না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আর উদার বিবেকপ্রধান ভারতে টিকিবে না। আমার হইয়া তুমি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, আর আমি অলস ভাবে বসিয়া থাকিব, এ অর্থশূন্য ধর্ম্ম আর ভারতে স্থান পাইবে না। যদি মানুষ হও, যদি দেশের হিতৈষী হও, এই বিশেষ সময়ের বিশেষ ভাব হৃদয়-ঙ্গম কর—করিয়া বল, চাই—জ্ঞান, চাই প্রেম, চাই কর্ম্ম। মহা মিলনের দিনে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য কর, আর বল, চাই—জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্ম। মত লইয়া ভারতে অনেক কাটাকাটী হইয়া গিয়াছে,—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে,জাতিতে জাতিতে ভারতের অস্থি মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে,—ভ্রাতার বুকের রক্তে অনেক ভ্রাতার রক্ত-পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে, আর না। যে যেখানে থাক, এস। জ্ঞানী, প্রেমিক ও কর্ম্মী, সকলে একবার একতার মধুময় মিলনের মন্ত্র মুখে তুলিয়া এস। ঘৃণা বিদ্বেষ দূর হউক,—শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার পরিবারের পার্শ্বে অজ্ঞান আঁধারে আমি থাকিলে,ভাই তোমার পরিবার কখনই জ্ঞানী হইতে পারিবে না, আমার চরিত্র দূষিত থাকিলে, কখনই ভাই তোমার চরিত্র ভাল থাকিবে না। তবে ভাই এস, তোমার চরণধূলি আমার মাথায় ছোঁয়াও। এস, পরস্পরে পরস্পরের বিশেষ বিশেষ ভাব গ্রহণ করি। প্রেমিক প্রেম দেও, জ্ঞানী জ্ঞান বিলাও, কর্ম্মী কর্ম্ম শিখাও। আদান প্রদানের প্রশস্ত পথ খুলিয়া যাউক। একের জীবনে যাহা নাই, তাহা অন্যের নিকট পাইয়া কৃতার্থ হই, ধন্য হই। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে একেবারে পরি-ত্যাজ্য কিছুই নাই, কে কাহাকে ঘৃণা করিবে? সকলই ভাই ভাই,—সকলের ভিতরেই বিশেষত্ব লুক্কায়িত। তবে এস, মত ভুলিয়া, ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া, অহংতত্ত্ব ভুলিয়া, পরস্পর এই মহা মিলনের দিনে মিলিত হই, মিলিয়া, এক হইয়া মহা সিন্ধুর দিকে ধাবিত হই। এস, আনন্দের দিনে মহানন্দে নৃত্য করি। এমন মনো-মুগ্ধকর মিলনের স্থলে সঙ্কীর্ণতা, সন্দেহ, বিবাদ, বিসম্বাদ কেন আনিতেছ? কেবল পূর্ব্বকে লইয়া থাকিবে, পশ্চিমকে তুচ্ছ করিবে? কেন পশ্চিম কি বিধাতার সৃষ্ট নয়? পশ্চিমে কি বিশেষত্ব নাই? পশ্চিমের কর্ম্মকে আদর করিতেই হইবে। খ্রীষ্ট, চৈতন্য ও বুদ্ধ এক হইয়াছেন এই ভারতে, একবার চাহিয়া দেখ। যদি মনুষ্যত্ব লাভের বাসনা থাকে, তবে অগ্রে সিদ্ধি লাভের জন্য নিভৃত হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ কর, পরে মানবের উদ্ধারের জন্য,প্রাণকে কর্ম্মের স্রোতে ভাসা-ইয়া দেও। সিদ্ধ হইয়া,জ্ঞান-কর্ম্মকে জীবনের ভূষণ করিয়া, ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। জ্ঞান, প্রেম,কর্ম্ম,তিনকে হৃদয়ে বাঁধ,—বুদ্ধ,চৈতন্য, খ্রীষ্ট, তিনের বিশেষ ভাবকে অবলম্বন কর। বিশেষ সময়ের বিশেষ ভাব বুঝিয়া দেশের জন্য চিন্তিত হও। পূর্ব্ব পশ্চিম মিলিয়াছে, উত্তর দক্ষিণ মিলিবে যে ধর্ম্মে, সে ধর্ম্মের ভাব এই। পাশব বল ভারতে নাই বলিয়া দুঃখ নাই; ভারতের বিশেষ ভাব এই,ভারত জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মে মিলিয়া আধ্যাত্মিকবলে পৃথি-বীকে এক হৃদয়ে বাঁধিবে হিংসা বিদ্বেষ সকল নাশ করিয়া,অহঙ্কারকে ডুবাইয়া,গঙ্গা যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা সকল একীভূত হইয়া,মহা-সিন্ধুতে মিলিবে। সেই দিন কবে আসিবে, যে দিন ভারত, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম, এই তিনের সমন্বয়ীভূত সাধনায় সিদ্ধ হইয়া পৃথিবীর সকল নর-নারীকে এক হৃদয়ে

বাঁধিয়া, মেঘনার ন্যায় মহাসিন্ধুতে জীবন ভাসাইতে পারিবে! সেই শুভ মুহূর্ত্ত কখন দেখা দিবে, যখন এই মহা সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রসন্ন চিত্তে, আনন্দে আনন্দময়ীর নাম কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া, ভারত-সন্তান, আর্য্য অনার্য্য বিচার ভুলিয়া, কুসংস্কারের কঠিন আবরণ ছিন্ন করিয়া, কর্ত্তব্যের কঠোর ভাবে বিভোর হইয়া,পৃথিবীকে সমস্বরীভূত উন্নতি-আনন্দের বার্ত্তা শুনাইবে,—কবে সঙ্কীর্ণ দ্বেষ হিংসাযুক্ত মত-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া, ভাই ভগ্নী মিলিয়া, জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের মঙ্গলময় পূজা অর্চনায় রত হইবে,—কবে ভারতের চির মরণ-জাল ছিন্ন হইবে,—কবে ভারত প্রকৃত জীবন পাইবে!!

ইন্দুবালা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"একাকিনী—বিরহিনী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।"

তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য।

সায়াহ্ন। নিদাঘের প্রচণ্ড প্রভাকরের অগ্নিময় কিরণে ধরাতল সমুদায় দিবস পুড়িয়াছে, এক্ষণে উত্তাপ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। জীবগণ পুনর্ব্বার আশ্বস্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। গৃহরুদ্ধ ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে ঘরের বাহির হইতে সাহস পাইতেছে।

এমন সময়ে আলাহাবাদে—একটী বৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলস্থিত প্রকোষ্ঠে এক সুন্দরী বেত্রাসনে হেলিয়া বসিয়াছেন। হাতে এক খানি কাগজ। জানালা দিয়া বাহিরে শূন্য চক্ষুতে তাকাইয়া রহিয়াছেন। ইহার বয়স সপ্তদশবর্ষ, কিন্তু গঠনের ও মুখের ভাব এমনি যে, তাহাকে দেখিলে তাঁহার বয়স তাহা হইতে ন্যূন বোধ হয়। সমুদয় শরীর এমনি সুকুমার, দেখিলে বোধ হয় যেন বিধাতা তাহাকে কোমলতা দিয়া রচনা করিয়াছেন,কিন্তু এই মোহন মূর্ত্তিতে প্রফুল্লতার বিকাশ নাই, আনন্দের গরিমা নাই—ইহাতে কেমন এক প্রশান্ত বিষণ্ণ চিন্তা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে ইনি ইন্দুবালা। হস্তে যে পত্র রহিয়াছে, তাহা অনেকবার পড়িয়াছেন। এক্ষণে তাহা আর পড়িতেছেন না। কিন্তু প্রাণাদপিপ্রিয় বস্তুর ন্যায় তাহা সুকোমল হস্তে ধারণ করিয়াছেন—চিন্তাতে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। পাঠক মনে করিবেন যে, এই পত্র হয়ত ইন্দুবালার স্বামীর নিকট হইতে আসিয়াছে, ইহাতে তাঁহাকে তাহার শ্বশুরালয় যাইতে হইবে, এই কথা আছে। তাহা ভুল। পত্রোক্তি ছিল তাহা আমরা নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

মিরট, বৈশাখ, ১২ সাল—

স্নেহময়ি,

"তোমাকে লিখিবার নিমিত্ত লেখনি হস্তে করিয়া অনেক ক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিলাম, এক্ষণও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছিনা। আমার আর কিছু মাত্র দৃঢ়তা নাই, বল নাই, অদ্য দীর্ঘকালের পর তোমাকে আজ লিখিতে গিয়া বালকের ন্যায় অধীর হইয়াছি। সকলি শুনিয়াছি—তোমার দিন কেমনে যাইতেছে, তাহা শুনিয়াছি। কিন্তু সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা; আমরা মনুষ্য,

বুঝি না কিসে ভাল হয়। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহা কে নিবারণ করিতে পারে? অতএব যত দিন বাঁচি, তত দিন এই রূপে যাইবে। আমি বাতাসে ছিন্ন পত্রের ন্যায় এই সংসারে বিচরণ করিতেছি। ভরসা নাই, সুখের সম্ভাবনা নাই, যন্ত্রণার অবধি নাই। মরুভূমি—সংসার মরুভূমি। তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত কতবার উন্মাদের ন্যায় আলাহাবাদের নিকট আসিয়াছিলাম, আবার ক্ষিপ্তের ন্যায় তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছি। তোমার আমার সাক্ষাৎ এখন অমঙ্গলজনক, তন্নিমিত্ত নিতান্ত অকর্ত্তব্য, তুমি সরল প্রকৃতি, অসন্দিগ্ধান, তুমি আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর, নির্ভর কর, তাই বলি, ইন্দু, আমায় আর পত্র লিখিও না, আমায় আর ক্ষিপ্ত করিও না। তোমার হস্ত-লিখিত একটী অক্ষর দেখিলে আমি ক্ষিপ্ত হইয়া যাই। তুমি লিখিয়াছ—"আর সহে না।" আত্মহত্যা কি পাপ? ইন্দু "আর সহেনা" আমিও বলি; কিন্তু আত্মহত্যা কি পাপ?—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমার হৃদয়ে তুমি দারুণ আঘাত করিয়াছ। এত কাল শিক্ষার পর, শাস্ত্রাধ্যয়নের পর, আত্মহত্যা পাপ কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলে! ইন্দু, আমার শিক্ষার কি এই ফল? তাহা অবশেষে কি ঘৃণিত আত্মহত্যাতে পরিণত হইবে? আমি বুঝি, তুমি যন্ত্রণায় এই কথা বলিয়াছ। তবে বলি, আমিও মরিতে পারিতাম, আমি যে বাঁচিয়া রহিয়াছি তাহা কি মরিবার ভয়ে? যদি আত্মহত্যা পাপ না হইত, তাহা হইলে এই যন্ত্রণাময় জীবন এত দিন কোন্ কালে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম। ইন্দু, আমার উপদেশ, আমার আজ্ঞা—তুমি এই পাপময় চিন্তাকে কদাপি মনে স্থান দিবে না, দিলে আমি বড় কষ্ট পাইব।

ইন্দু, আরো তোমায় কিছু বলিবার আছে, বলিতে অনেক চেষ্টা করিতে হইতেছে। তুমি বলিবে যে, যাহা অসাধ্য তাহা কেন আমাকে করিতে আদেশ করেন। আমি আদেশ করিতেছি না, আমার মিনতি, তুমি তোমার স্বামীর নিকট যাও, গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হও, আমাকে ভুলিয়া যাও। এই জীবনে আমার আর সাক্ষাৎ পাইবে না। এই আমার শেষ পত্র। আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি, আমাকে আর পত্র লিখিও না। আমার এক মাত্র মিনতি, তুমি তোমার পতির প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলা করিও না। এই সংসারে আমরা সুখের নিমিত্ত আসি নাই, কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত আসিয়াছি। ইন্দু, তোমাকে পাইবার আমার কোন আশা নাই, সম্ভাবনা নাই। তবে, আমার এক মাত্র সুখের প্রার্থনা যে, তুমি কঠোর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ক্রমে আদর্শচরিত্রা হইবে, পরিণামে অবনীমণ্ডলে তোমার পবিত্র নাম চিরকাল পূজিত হইবে।"

তোমার আশাশূন্য—পরিব্রাজক।

ইন্দুবালা আবার এই পত্র খানি খুলিয়া পড়িলেন। "আমার মিনতি, তুমি তোমার স্বামীর নিকট যাও—গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃত হও, আমাকে ভুলিয়া যাও"—পড়িয়া থামিলেন, অর্দ্ধ স্ফুট স্বরে বলিলেন,—"আমাকে ভুলিয়া যাও"—আমি তাঁহাকে ভুলিয়া যাইব? কি প্রকারে?—কত দিনে, জীবন থাকিতে, না মরিলে পরে?—"আমাকে ভুলিয়া" যাও"—কই, এই দীর্ঘ কালেও ভুলিতে পারিলাম না, দিন দিন যে সেই মূর্ত্তি স্মৃতিতে আরও গভীর রূপে খোদিত হইয়া

যাইতেছে—এই জীবনের এক মাত্র চিন্তা যে সেই স্মৃতি। এখনও যে সেই দেবা-কৃতি, সেই স্নেহময়, সেই পবিত্রতাময়, জ্যোতির্ম্ময় মুখশ্রী দেখিতেছি, এখনও যে সেই অনন্ত সুধাপূর্ণ শব্দ পান করিতেছি, সেই দেববাক্য শুনিতেছি। তাঁহাকে ভুলিব?—কেমনে? হে গুরো, হে স্বামিন্,—স্বামিন্—কি বলিলাম?—স্বামিন্? কি মধুর শব্দ—কিন্তু আমার তাহা বলিবার অধিকার কি?—অধিকার নাই? যাহাকে আজীবন ভাল বাসিলাম, যাহাকে ভিন্ন আর কাহাকে মনে আনিলাম না, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত জানিলাম না, যাঁহার নাম নিরবধি জপ করি, যাঁহার নিমিত্ত এই প্রাণ সতত দিতে প্রস্তুত,—তাঁহাকে আমার স্বামী বলিবার অধিকার নাই, কি প্রকারে স্বীকার করি?—যিনি অনন্যভাবে আমার হৃদয়ে বিচরণ করিতেছেন, যিনি আমার সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করিয়াছেন, যিনি আমার হৃদয়ের একমাত্র পতি, তাঁহাকে যদি আমার স্বামী বলিবার অধিকার না থাকে, তাহা হইলে জগতে কোন স্ত্রীলোকের কোন পুরুষকে স্বামী বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু তিনিই যে স্বামী নাম লইতে অস্বীকার করেন। "আমার একমাত্র মিনতি তুমি তোমার পতির প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলা করিও না"—আরও লিখিয়াছেন, "এই সংসারে আমরা সুখের নিমিত্ত আসি নাই, কর্ত্তব্যসাধনের নিমিত্ত আসিয়াছি।" সত্য, কর্ত্তব্যসাধনই জীবনের লক্ষ্য, কিন্তু আমি যে কর্ত্তব্য সাধনে অসমর্থ, আমি নিতান্ত দুর্ব্বল, নিতান্ত স্বার্থপর,—নিতান্ত নীচ, তাহা না হইলে—আমার সুখের নিমিত্ত তাঁহাকে বারম্বার কর্ত্তব্যের পথ হইতে ফিরাইবার আকাঙ্ক্ষা করি কেন? তিনি ত আমার জন্য গৃহত্যাগী—দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছেন, তথাচ ত একবারও আমাকে সুনীতি-বর্জ্জিত কথা বলেন নাই। আমার কি পবিত্রতাতে আস্থা নাই, ধর্ম্মে মতি নাই? আছে, কিন্তু প্রবল স্রোতে যে সকলই ভাসিয়া যাইতেছে। কি করি? দুর্ব্বল মনকে ত কত বুঝাই,—সংযমের ত চেষ্টা করি, তবু যে পারি না—কখন কি পারিব না? তিনি লিখিয়াছেন—"ইন্দু, তোমাকে পাইবার আমার কোন আশা নাই, সম্ভাবনা নাই—তবে আমার একমাত্র সুখের আশা যে, তুমি কঠোর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে আদর্শ-চরিত্রা হইবে, অবনীমণ্ডলে তোমার পবিত্র নাম চিরকাল পূজিত হইবে" তাঁহার একমাত্র সুখের আশা—আর আমি যত্ন করিব না? ইন্দুবালা এই রূপে চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার ঘরে একটী তরুণ বয়স্ক যুবা প্রবেশ করিলেন। ইনি ইন্দুবালার ভ্রাতা, বয়সে তাঁহার অপেক্ষা ২ বৎসর বড়, ইন্দুর সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে।

নির্ম্মলচন্দ্র ডাকিলেন। ইন্দু চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতা। হস্তস্থিত পত্রখানি ধীরভাবে এক খানি পুস্তক দিয়া চাপিয়া রাখিলেন, নির্ম্মলচন্দ্র তাঁহার নিকট গিয়া বসিলেন, ক্ষণকাল পরে বলিলেন—"ইন্দু"—ইন্দুবালা নীরবা—বিষণ্ণবদনা। নির্ম্মলচন্দ্র ক্ষণকাল পরে আবার বলিলেন—'তুমি কি ভাবিতেছ।' ইন্দু উত্তর করিলেন না, কেবল মাত্র তাঁহার ভ্রাতার মুখের দিকে নীরজনয়নে চাহিয়া থাকিলেন। ইন্দু কাহাকেও বেদনা দিতে চাহিত না, নিজের কষ্ট নিজের মনেই

রাখিত। ইন্দু জীবনে মিথ্যা কথা কহিতে পারিত না, সুতরাং অনেক সময়ে অনেক কথার উত্তর করিতে পারিত না। নির্ম্মল আবার বলিলেন, 'ইন্দু, তুমি কি ভাবিতেছ?" ইন্দুবালা বলিলেন—"আমি ভাবিতেছি—বিশেষ কিছু নহে। আপনার তাহা শুনিয়া কি হইবে?" তাঁহার ভ্রাতা আবার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, পরে বলিলেন—'ইন্দু, তোমার শ্বশুরবাটী হইতে যে পত্র আসিয়াছে, মা কি তাহার বিষয় তোমাকে বলিয়াছেন'? ইন্দু একটু চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "না, আমি কিছুই শুনি নাই।' নির্ম্মল—"তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, কল্য তোমাকে লইতে লোক আসিবে।" ইন্দু—"কল্য?"

নির্ম্মল—হাঁ—তুমি কি বল, যাবে?

ইন্দু উত্তর করিল না। তাহার কোমল-কান্তি বদনে বিষাদের ছায়া যেন আরও কিছু গাঢ়তর হইল। ইন্দু শূন্য নয়নে তাকাইয়া রহিল। নির্ম্মল আবার বলিলেন—"যদি তোমার এখন সেখানে যাওয়া অমত হয়, আমি বাবাকে না হয় তোমার না যাওয়ার কথা বলি।" ইন্দু আবার নির্ম্মলচন্দ্রের মুখের পানে স্নিগ্ধভাবে চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকিলেন। ক্ষণকাল পরে মৃদুস্বরে বলিলেন—"আমার যাওয়ার অমত নাই।" নির্ম্মলচন্দ্র আশ্চর্য্য হইলেন, ইন্দুবালার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—ইন্দু গম্ভীর, কিন্তু প্রশান্ত। নির্ম্মল ইন্দুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "ইন্দু, ইহা কি তোমার যথার্থই ইচ্ছা—না নিজকে বলিদান দিবে বলিয়া যাইতেছ?" ভগিনী কোন উত্তর দিলেন না। জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুছিলেন, এক বিন্দু অশ্রু পড়িয়া থাকিবে। নির্ম্মল বুঝিলেন, ইন্দু যে সম্মতি দিয়াছে, এতকাল পরে যাইতে চাহিতেছে, তাহা নিজের সুখের জন্য নহে, তাহার অন্য কোন কারণ আছে। তিনি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল বলিলেন, "ইন্দু, আমি তোমার কষ্ট বুঝি।" এই বলিয়া ভগিনীর কোমল-কেশ-কলাপ-শোভিত মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলেন, "এক্ষণে আমি চলিলাম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজপুতানার একটী গিরি-গহ্বরে, শ্মশ্রুধারী ভস্ম-মার্জ্জিত দেহ সেই কৌপীন-পরিহিত যুবা অর্দ্ধ শয়ান। চিন্তা—"এতদিন তাহার কোন সংবাদ পাই নাই, আমার পত্র পৌঁছিয়াছে কি না তাহাও জানিতে পারি নাই। গোস্বামী মহাশয় ফেরেন নাই। আর জানিয়াই বা কি হইবে? পত্র লিখিয়া ভাল করি নাই। হয়তো নির্ব্বাণোন্মুখ শিখা উদ্দীপ্ত করিয়াছি। আমি যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ইন্দু এক্ষণে শ্বশুরালয়ে। আমি নিষ্ঠুর, তাহা না হইলে ইন্দুকে কেন শ্বশুরালয়ে যাইতে বলিয়াছি। মন একস্থানে, শরীর একস্থানে। ইন্দু আমাকে ভালবাসিয়া কি প্রকারে তাহার পতি সেবা করিবে, কেমনে যথার্থ পাতিব্রত্য লাভ করিবে? তবে ইন্দু ক্রমে ক্রমে স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিতে পারে, আমাকে ভুলিয়া যাইতে সক্ষম হইতে পারে। ইন্দু আমাকে ভুলিয়া যাইবে! ইন্দু! তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইবে? না, তাহা তুমি পার না, পারিলেও তুমি আমাকে ভুলিও না। অনন্ত কাল পুড়িব, সেও ভাল—এই দহনে, এই অতৃপ্ত পিপা-

আর, এই জীবন্ত মৃত্যুতে যে সুখ আছে, তাহা জগতে কোথাও পাই না। অশান্তিতে যে সুখ আছে, তাহা শান্তিতে নাই। আমি শান্তি চাহি না, অর্থের সুখ চাহি না, আমি কেবল মাত্র ইন্দুর ভাল-বাসা চাহি; তবে এই ভালবাসার পরিণাম—সার্থকতা, সফলতা কোথায়? স্বর্গ ত দেখিলাম—কিন্তু আমি স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত। চন্দ্র আকাশে উদিত, কিন্তু গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন। তাই বলি, আর এই চিন্তার ফল কি? ফল নাই, তাহা বেশ দেখিতেছি, কিন্তু ইন্দুকে ভুলিতে পারিব না! কিন্তু ভুলিতে চেষ্টা করিব। নির্জ্জনে বাস করিয়া দেখিয়াছি, বিস্মৃতি লাভ করিতে পারি নাই! এখন দেখি, সমাজের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়ে পরোপকারে নিবিষ্ট হইয়া, দুঃখীজনের দুঃখ মোচন করিয়া, অত্যাচারীদিগের দম্ভ ও নিষ্ঠুরতার প্রতিবিধান করিয়া, প্রবঞ্চকদিগের কূট জাল ভেদ করিয়া, মনকে কতক ব্যাপৃত রাখিতে পারি কি না। এই দেশে কত লোক দুঃখী; রাজা কি পাপী!—এমন মহৎ পিতার এমন কুসন্তান কখনও দেখি নাই। বয়স অল্প, ইন্দ্রিয়াশক্ত, মদ্যপায়ী কুমন্ত্রী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই রাজ্যে কি প্রকারে সুশাসন হইতে পারে? আমি সংবাদ পত্রে যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে উপকার হইতে পারে। রাজা এবং মন্ত্রিগণ সশঙ্কিত হইয়াছে, অপরিজ্ঞাত লেখকের অনুসন্ধান করিতেছে, কিন্তু সুশাসনের কোন উপায় করিতেছে না। আমি সকলই অবগত হইয়াছি। আর বিলম্ব করিলে চলে না। অত্যাচারীদিগের মস্তকে বজ্রাঘাত করিব—এই প্রবন্ধটী অদ্যই লিখিব, কল্য প্রাতে সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দিব; ইহার উপরে ব্রিটিস-রাজের অবজ্ঞাপূর্ণ চক্ষু পড়িবে, তাহা হইলেই সংস্কার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে।

পরিব্রাজক এই প্রকার ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সেই গহ্বরে দুইটী অস্ত্রধারী পুরুষ প্রবেশ করিল। পরিব্রাজক উঠিয়া বসিলেন এবং গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কি চাই?"

অস্ত্রধারী পুরুষের মধ্যে এক জন বলিল—"আপনাকে"।

তিনি আবার গম্ভীরস্বরে বলিলেন "কেন?" সেই অস্ত্রধারী পুরুষ বলিল—"রাজ আজ্ঞা"।

পরিব্রাজক প্রশান্ত ও দৃঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইতে হইবে?"

অস্ত্রধারী পুরুষ—"রাজ ভবনে"।

পরিব্রাজক—"চল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিব্রাজক রাজার একটী নিভৃত কক্ষে দণ্ডায়মান। তাঁহার সম্মুখে রাজা ও রাজমন্ত্রী। পশ্চাতে তরবারি হস্তে এক জন সেনা। রাজা মন্ত্রীর হস্ত হইতে কয়েক খানি কাগজ লইলেন এবং সেই কাগজ পরিব্রাজককে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছ?" পরিব্রাজক হস্তপ্রসারণ করিয়া কাগজগুলি লইলেন, নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধগুলি ধীরে ধীরে দেখিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন—"মিথ্যা কহিলে নিস্তার নাই।" পরিব্রাজক এই কথা শুনিয়া তাঁহার আরক্ত লোচনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষণকাল রাজার উপর স্থির করিয়া রাখিলেন। দৃঢ়তা ও অবজ্ঞাসূচক ওষ্ঠ ঈষৎ প্রকম্পিত হইল। আবার তিনি প্রশান্ত বদনে সেই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠান্তে বলিলেন, "হাঁ, এই গুলি আমার লেখা।" রাজা এবং মন্ত্রী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—"ইহা

তোমার লেখা, আমাদিগের প্রত্যয় হয় না।” পরিব্রাজক বলিলেন—“আপনাকে, ইহা যে আমার লেখা, সে প্রত্যয় করাইয়া দিতে আমি স্বয়ং এখানে আসি নাই, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বলিয়া আমি এই কথা প্রকাশ করিলাম।” রাজমন্ত্রী—“মহাশয় অবশ্যই সত্যবাদী, কিন্তু সন্ন্যাসীকে অদ্যাবধি সংবাদপত্রে রাজনীতি সমালোচনা করিয়া লিখিতে শুনি নাই, সেই নিমিত্তই আপনার কথা সহসা বিশ্বাস হইতেছে না, আপনি সত্যবাদী, সহজেই তাহা প্রমাণ করিতে পারেন। আপনি আমাদিগের সম্মুখে একটী প্রবন্ধ লিখুন।” পরিব্রাজক বলিলেন—“তাহাতে আমার আপত্তি নাই।” রাজ-মন্ত্রী তাঁহাকে লিখনোপযোগী সামগ্রী দিলেন। পরিব্রাজক যে প্রবন্ধটী সেই দিন লিখিবেন, মনে করিয়াছিলেন, সেইটি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সেই প্রস্তাবটী সমাপ্ত না হইতেই রাজা অধীর হইয়া পরিব্রাজকের হস্ত হইতে কাগজ লইলেন, এবং পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কতকদূর পড়িয়াই তাঁহার মুখে বিষম আশঙ্কা এবং ক্রোধের লক্ষণ আবির্ভূত হইতে লাগিল। যতই পড়িতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনের উদ্বেগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং পাঠ সমাপ্ত হইলে মন্ত্রীর হস্তে কাগজ দিলেন। মন্ত্রীও উৎকণ্ঠার সহিত তাহা পাঠ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে, রাজা বলিলেন,—“তুই আমার রাজ্যে বাস করিয়া কি সাহসে এইরূপ লিখিতেছিস্? তোর মনে কি যন্ত্রণার ভয় নাই, মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। তোর মৃত্যু নিকট, তাহা না হইলে কেন এই কুমতি হইবে?” পরিব্রাজক বলিলেন—“মহারাজ, কুমতি আমার নহে, কুমতি আপনার। তাহা না হইলে আপনি একবারে কর্ত্তব্য জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া, ইন্দ্রিয়ের দাস হইবেন কেন? তাহা না হইলে আপনি মদ্যপায়ী পাষণ্ডদিগের বশীভূত হইয়া যথেচ্ছাচার করিবেন কেন? তাহা না হইলে আপনার রাজ্যে এত অত্যাচার কেন? দেশে হাহাকারে শব্দ, আর আপনি নৃত্য গীত, বাদ্য ও সুরাতে মত্ত। আরও অনেক কথা আছে, অনেক কথা জানি,—আপনার দুষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে; সাবধান, মহারাজ পাপের বিনাশ বিলম্বে বা সত্বরে হইবেই হইবে। আমাকে আপনি ইচ্ছা করিলেই বিনাশ করিতে পারেন বটে। কিন্তু তাহাতে আপনার পাপের বৃদ্ধি হইবে কেবল মাত্র—কিন্তু বিপদের লাঘব হইবে না।”

রাজা। “তোমাকে এখনই মুক্ত করিলে কি তুমি আবার আমার বিরুদ্ধে লিখিবে?”

পরি। “হাঁ, যতদিন আবশ্যক হইবে, যতদিন দেশে অত্যাচার থাকিবে, আর যতক্ষণ এই হস্ত চালনা করিবার ক্ষমতা থাকিবে।”

রাজা। “আচ্ছা আমি তোমার লিখিবার সুবিধা করিয়া দিতেছি”—রাজা সেনার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন—“প্রহরি! ইহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখ গিয়া। ইহার হস্ত পদ লৌহ-শৃঙ্খল দিয়া আবদ্ধ রাখিবে।” প্রহরী পরিব্রাজককে লইয়া গেল। পরিব্রাজক কারাগার থাকিলেন। রাজ্যে দিন দিন আরও বিশৃঙ্খল বাড়িতে লাগিল। ব্রিটিস রাজের নিকট হইতে দুই একখানি ভীতি-প্রদর্শক পত্র আসিল। পরিব্রাজকের প্রতি রাজার মনে মনে ভক্তি হইয়াছিল। কয়েক দিন পরে রাজা আবার পরিব্রাজক-

কে সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি এখনও আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে? কারাবাসের যন্ত্রণায় তোমার কি এখনও জ্ঞানের উদয় হয় নাই।"

পরিব্রাজক বলিলেন, "মহারাজ, আমি কারাবাসের যন্ত্রণা ও ভয় করি না, মৃত্যুকেও ভয় করি না। আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা আপনার মঙ্গলের জন্য। আপনি আমার পরামর্শানুসারে কাজ করিলে আপনি অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারিতেন। আপনার চক্ষু এখনও খুলিল না! দেশে অত্যাচারের সীমা নাই। দরিদ্র লোক সকল অনাহারে অত্যাচারে মরিতেছে। সৈন্যগণ তাহাদিগের প্রাপ্য মাহিয়ানা বহুদিন হইতে পায় নাই। রাজ কর্ম্মচারীরা যদৃচ্ছাক্রমে প্রজাদিগের উপর নানা প্রকারে অত্যাচার করিয়া কর আদায় করিতেছে। যাহা আদায় করে তাহা কোষাগারে দেয় না, প্রায় সমুদয়ই চুরি করে। কোষাগারে টাকা নাই। প্রজাগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। প্রজাগণের অবস্থা এইরূপ—রাজস্বের অবস্থা, সৈন্যগণের অবস্থা এইরূপ,—আর আপনি চক্ষু মুদিয়া মজা করিতেছেন, আমি আপনাকে বলিতেছি—আপনার রাজ্যে শীঘ্র প্রজাবিদ্রোহ হইবে, সেই বিদ্রোহ কি প্রকারে দমন করিবেন? সৈন্যগণ প্রাপ্য বেতন না পাইলে কখনই বাধ্য থাকিবে না, আর আপনি কোথা হইতেই বা তাহাদিগের বেতন দিবেন? যখন প্রজাগণ বিদ্রোহী হইবে, সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইবে, তখন আপনাকে কে রক্ষা করিবে? আর যদিও প্রজাগণ, কি আপনার সৈন্যগণ আপাতত কিছু কালের নিমিত্ত বিদ্রোহাচরণ না করে, তথাচ আপনি কি মনে করেন, বিটিশ-ব্যাঘ্র, আপনি এই প্রকার আচার করিলে, আপনার রাজ্যে এই প্রকার বিশৃঙ্খল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইলে, আপনাকে কি নির্ব্বিবাদে এই সিংহাসনে থাকিতে দিবে? মনেও করিবেন না। ইংরাজ সতত রাজ্যলোলুপ। সাতরা, ঝান্সি, নাগপুর যাহারা অছিলা করিয়া অনায়াসে আত্মসাৎ করিল, ওয়াজিদ আলিকে তাড়াইয়া দিয়া যাহারা অযোধ্যা কাড়িয়া লইল, আপনার রাজ্যের উপর কি তাহাদিগের দৃষ্টি নাই? আকাশে ঘন কাল মেঘ উঠিতেছে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শীঘ্র ঝড় উঠিবে—আপনাকে কে রক্ষা করিবে? আরও যদি শুনিতে চাহেন, আমি আপনাকে বলি, রাজ্যে আপনার কত শত্রু আছে।" বলিয়া তিনি অনেক গূঢ় কথা বলিলেন। ষড়যন্ত্রের অবস্থা সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া রাজা স্তম্ভিত হইলেন, শেষে বলিলেন, "উপায়?"

পরি। আমি বলিতেছি, আপনি প্রথমে আপনার অসাধু ও পশুবৎ পারিষদদিগকে দূরীভূত করুন। রাজকার্য্য স্বয়ং পর্য্যালোচনা করুন। যাহারা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান অপরাধী কয়েক ব্যক্তিকে হৃদয়কম্পনকারী দণ্ড দেন। সুশাসন যাহাতে হয়, তাহার জন্য আপনি স্বয়ং অভিযোগ শুনিবেন, যাহার যে কষ্ট থাকে আপনি তাহা অচিরাৎ মোচন করিবেন, এই ঘোষণা করিয়া দেন ও সেই মত কার্য্য করুন। যাহারা রাজস্ব চুরি করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে দুই এক জনকে কঠোর শাস্তি দিয়া

সৎ ব্যক্তির হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার দিন। আপনার মহামূল্য রত্ন কিঞ্চিৎ বিক্রয় করিয়া আপাতত সৈন্যদিগের কতক বেতন শোধ করিয়া দিন এবং ভবিষ্যতে তাহাদের বেতন রীতিমত দেওয়া হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিন। আপনি কার্য্য করিতে আরম্ভ করুন, পরামর্শের অভাব হইবে না। আপনার ইচ্ছা থাকিলে অনেক জ্ঞানী লোক আসিয়া পরামর্শ দিবে।

রাজা বলিলেন—"মহাশয় আমার একটী মিনতি, আপনি রাজ-মন্ত্রী হউন।"

পরিব্রাজক বলিলেন, মহারাজ, আমি সংসারাশ্রম ছাড়িয়া দিয়াছি। সুতরাং আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। আর আমি কবে কোথায় থাকি, তাহারও স্থিরতা নাই। তবে যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে আমি এক জন সুযোগ্য লোককে আপনার মন্ত্রী ঠিক করিয়া দিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, আমি এবিষয় বিবেচনা করিয়া আপনাকে বলিব। আপনি এক্ষণে আপনার আবাস-স্থানে যাউন। এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

নবজীবন ও বিধবা বিবাহ।

নবজীবন-সম্পাদক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সাবিত্রী লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে, "হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না," বিষয়ে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, (১) তাহা লইয়া সংবাদ পত্র সমূহে একটী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, প্রায় সমস্ত পত্রিকাই অক্ষয় বাবুর মতের বিরুদ্ধে লিখিতেছেন। এই উপলক্ষে হিন্দু সমাজের মধ্যে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আবার একটু আন্দোলন উঠিয়াছে। অক্ষয় বাবুর কবিত্বপূর্ণ, বাগাড়ম্বরপূর্ণ, যুক্তিতর্ক-শূন্য, অসংলগ্ন প্রবন্ধের মত শুনিয়া, বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ, এই উভয় সম্প্রদায়ই কিছু বিস্মিত হইয়াছেন। অক্ষয় বাবু পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত; তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিকে একদেশদর্শীরূপে বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করিতে দেখিলে সকলেরই বিস্মিত হইবার কথা। ভারতবর্ষে এখনও হিন্দু শাস্ত্রালোচনা একেবারে রহিত হয় নাই, এরূপ স্থলে যাহা-তাহা বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাওয়া বড়ই বিড়ম্বনা। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধে যে সকল অসংলগ্ন যুক্তি তর্ক ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বিজ্ঞ সমালোচকগণের কঠোর লেখনীর আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাঁহার শাস্ত্রের যুক্তি সকল একদেশদর্শী বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তিনি সে সকল সমালোচনার প্রতিবাদ না করিয়া,"নবজীবনের আটবৌড়ে" প্রকাশ করিয়া যতই, গালিগালাজ বর্ষণ করুন না কেন, শিক্ষিত-সমাজ এতই ভীত নহে যে, অন্ধরূপে তাঁহার কল্পনার কথা শুনিতে বা পালন করিতে বাধ্য হইবে। বঙ্গভূমি আজও শিক্ষা বা ধর্ম্ম শূন্য হয় নাই যে, যে যাহা বলিবে, তাহাই সকলে পালন করিবে। আপন বুদ্ধি বা বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করিয়া, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে কে আর অন্ধরূপে

(১) এই প্রবন্ধটী বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছে।

শাস্ত্রের কূট-ব্যাখ্যানুসারে কার্য্য করিবে? বিজ্ঞ বঙ্কিম বাবু পর্য্যন্ত বিগত বৎসর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্কীর্ণ, অনুদার, যাহা-তাহা রকম হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া, প্রথম সংখ্যক প্রচারে লিখিয়াছিলেন, "শাস্ত্রের সব কথাই যে মানিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।" ইত্যাদি (প্রচার ১ম সংখ্যা দেখ) অক্ষয় বাবু নিজেও শাস্ত্রের কথা মানিয়া চলিতে ইচ্ছুক নহেন, কারণ তাহা হইলে, তিনি কখনই শূদ্র হইয়া, মনুর বাক্য লঙ্ঘন করিয়া, হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেন না। তিনি শাস্ত্র না জানিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। তবে আমরা বুঝিতে বাধ্য হইয়াছি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি তাঁহার নিজের কুটিল অভিপ্রায়কে, শাস্ত্র, যুক্তি ও ধর্ম্মের অভিপ্রায় বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন;— তিনি নিজের কল্পিত অনেক কথা, শাস্ত্রের কথা বলিয়া, প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং তাঁহার প্রবন্ধ সুললিত ভাষার পরিচ্ছদে, হিন্দুধর্ম্মের নাম-অলঙ্কার এবং বাহ্য-সুন্দর যুক্তির বেশ বিন্যাসে এমনই সজ্জিত হইয়া সাধারণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, দেখিবামাত্র বড় মনোরম মূর্ত্তি বলিয়া, ভ্রম হয়। এই আপাত মধুর বাহ্য সৌন্দর্য্যে অনেকেরই প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্যই, অন্যান্য সম্পাদকগণের ন্যায়, আমরাও অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে যে কয়েকটী যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা ক্রমে তাহার সমালোচনা করিব।

প্রথমতঃ—"হিন্দুর জীবন ধর্ম্মপ্রধান, সকল ব্যাপারেই হিন্দু আধ্যাত্মিকদিকে দৃষ্টি-প্রখর। হিন্দুর বিবাহ ব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মায় আত্মায় মিল। হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস, মানবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে তাহার আত্মার ধ্বংশ হয় না, পরকালে বিশ্বাস হিন্দুর জাতিধর্ম্ম। এখন বলুন দেখি, হিন্দুনারী স্বামীর পরলোক প্রাপ্তিতে কি করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে যাইবে?"

অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন যে হিন্দুর বিবাহ আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। এবং ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপে বলিয়াছেন যে, এই আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠানের অর্থ আত্মায় আত্মায় যোগ। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, এই যে আত্মায় আত্মায় যোগ, তাহা কি দুইটী সমতুল্য আত্মার মধ্যে, না একটী ক্ষুদ্র একটী মহৎ আত্মার মধ্যে? যদি দুইটী সমতুল্য আত্মারই যোগ হয়, তবে তাহাদিগেরই যোগ সম্ভব; এবং সেই রূপ যোগ বা একীকরণই ইহকাল ও পরকাল-স্থায়ী। কিন্তু যদি দুইটী অসমতুল্য আত্মা একত্রিত হয়, তবে তাহাদিগের যোগ ত দূর্ব্বাদলের শিশির কণার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মাত্র। আত্মা যেমনই অবিনশ্বর, তেমনি নিয়ত উন্নতিপ্রার্থী। আপন আপন সুকৃত অথবা দুষ্কৃতের ফলে, আত্মাদ্বয়ের বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। দম্পতীর মধ্যে এক জনের আত্মা যখন দেবলোকে, অপরের আত্মা হয় ত

তখন রসাতলে,—একজন যখন নন্দনে, অপর হয়ত তখন রৌরবে। এরূপ স্থলে, আত্মার সহিত আত্মার যোগ কেবলই অর্থ-হীন শব্দ সমষ্টিমাত্র। অক্ষয় বাবু বোধ হয় বলিতে সাহস করিবেন না যে, দম্পতীর প্রত্যেক নরনারী সমান ধার্ম্মিক এবং তাঁহা-দিগের আত্মা সমতুল্য। ইহা হইতেই অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে যে, আধ্যাত্মিক বিবাহ, অর্থাৎ যে বিবাহে আত্মার সহিত আত্মার যোগ হয়, তাহা জগতে কত দুর্লভ। আমরা বলিতে পারি না যে, বিবাহ মাত্র হইলেই নরনারীর আত্মার একীকরণ হইল; কিন্তু যখন দেখিতে পাইব যে, একটী দম্পতীর আত্মাদ্বয়ের প্রকৃতিও সমরূপ, তখনই আমরা স্বীকার করিব যে, তাঁহাদিগের বিবাহই তাঁহাদিগের আত্মার একীকরণের উপায় এবং সেই রূপ বিবাহই আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। অক্ষয় বাবু যদি বলিতেন যে, এই রূপ দুইটী আত্মার একীকরণ না হইলে সে বিবাহ বিবাহই নয়, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জনিত পিপাসা নিবারণের উপায়মাত্র, তাহা হইলে আমরা বুঝিতাম যে, তিনি বিবাহের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত একবাক্যে বলিতাম যে, এইরূপ একীভূত দম্পতীর মধ্যেই বিচ্ছেদ নাই; এবং তাঁহাদিগের মধ্যেই একজনের মৃত্যুতে অপরের পুনর্ব্বার বিবাহের অধি-কার নাই। যে দম্পতী বুঝিয়াছেন যে, আমাদিগের এ সম্বন্ধ কেবল ইহ কালের জন্য নয়; পরকালেও আবার আমরা এক-ত্রিত হইব, তাঁহাদিগের বিবাহই প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিবাহ। অন্যথা বিবাহ মাত্র-কেই আধ্যাত্মিক বিবাহ বলিলে, আধ্যাত্মিক বিবাহের অবমাননা করা হয়। এ সম্বন্ধে আমাদিগের দ্বিতীয় কথা এই যে, এই আত্মায় আত্মায় যোগ, হৃদয়ে হৃদয়ে মিশ্রণ, তাহা কি বর এবং কন্যা উভয়ের মধ্যে, না তাঁহাদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধের উদ্যোগ-কর্ত্তা পুরোহিত এবং গুরুজনের মধ্যে? অশিক্ষিতা, অপ্রাপ্ত-বয়স্কা, সংসার-জ্ঞান-শূন্যা বালিকাকে তুমি বাধ্য করিয়া বলা-ইলে, বল "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং; পতিকুলে ভূয়াসম্;" বালিকা না জানিয়া না বুঝিয়া বলিল, "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং; পতিকুলে ভূয়া-সম্।" যদি এ মন্ত্র না বলাইয়া, তুমি তাহাকে বলাইতে, বল, "পতির্বধ্যঃ পতিশ্ছেদ্যঃ" তাহা হইলেও ত বালিকা বলিত,—"পতির্বধ্যঃ পতিশ্ছেদ্যঃ।" এ-ক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই যে প্রতিজ্ঞা, যাহার অর্থ দূরে থাকুক, যাহার ভাষা পর্য্যন্তও বিবাহেচ্ছু বুঝিল না, সে প্রতি-জ্ঞার কি কোন মূল্য আছে? না সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাকারী বাধ্য? এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া, যদি সেই বিবা-হের নাম আধ্যাত্মিক বিবাহ বলিতে চাও, বল, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই প্রতি-জ্ঞার অনুরোধে, হিন্দুনারীর স্বামীর পর-লোক-প্রাপ্তিতে পুনর্ব্বার বিবাহ অধর্ম্ম, একথা মুখেও আনিও না। যাহারা কুলী-দিগকে আসামে বা মরীশাসে পাঠায়, তাহারা তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে শিখাইয়া রাখে যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তোমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার উত্তরে কেব-লই বলিও—"আজ্ঞা হাঁ।" কখনও কোন কথায় অসম্মতি দিও না, দিলেই তোমা-দিগের বিপদ ঘটিবে। হতভাগ্য কুলী আপ-নার দুর্দ্দশা জানে না, আপনার ভবিষ্যৎ

বুঝিতে পারে না; ম্যাজিষ্ট্রেট যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তুমিকি আসামে যাইবে? কুলী বলিল—"আজ্ঞা হাঁ।" সেখানে ৫ বৎসর থাকিবে? উত্তর হইল—"আজ্ঞা হাঁ।" ম্যাজিষ্ট্রেট সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তুমি ত ইচ্ছা পূর্ব্বক সেখানে যাইতেছ? হতভাগা না বুঝিয়া, আপনার পায়ে আপনি কুঠার আঘাত করিয়া বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বকই যাইতেছি।" তখন সেত জানিত না যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। শেষে যখন পরীক্ষার দিন আসিল, আহারের অভাবে, রোগের যন্ত্রনায়, অত্যাচারী প্রভুর উৎপীড়নে, হতভাগ্যের জীবন তখন বড় ভার বোধ হইল। গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য, পত্নী পুত্রের মুখ দেখিবার জন্য, তাহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল। সে প্রভুর নিকট যাইয়া, কৃতাঞ্জলি পুটে বলিল, "প্রভো, আমার বড় কষ্ট, আমাকে বিদায় দিন।" কিন্তু তাহার নির্দ্দয় প্রভু বলিল, হতভাগ্য দাস, তুমি ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই এখানে আসিয়াছ, তবে আর যাইতে চাহিতেছ কোথায়? মরিতে হয়, তোমাকে এই স্থানেই মরিতে হইবে। বৈধব্যের যন্ত্রণা, সমাজের অত্যাচার সহ্য করিয়া, প্রবৃত্তির সহিত অহরহ সংগ্রামে পরাজিত-প্রায় হইয়া, বালিকা বিধবা যখন গদ গদ কণ্ঠে কৃতাঞ্জলি পুটে সমাজের নিকট যাইয়া বলিল, "আর আমি পারি না, আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, আমি অবলা, আমার উপর এ অত্যাচার কেন, আমার এবন্ধন একটু শিথিল করিয়া দাও! তখন নিষ্ঠুর, পরদুঃখপরাঙ্মুখ সমাজ তাহাকে বলিল,—পাপিয়সি, তুমি ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ,—তবে আবার আজি কোন্ প্রাণে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বিদায়ের কথা মুখে আনিতেছ? তোমার প্রাণ ফাটিয়া যায় যাউক কিন্তু "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং" প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন হইবে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, এই আসামগামী কুলী ও বালিকার বিবাহ কালীন প্রতিজ্ঞা কি সমতুল্য নয়? যাহা তাহারা বুঝে না, যাহার পরিণাম কি হইবে, তাহারা জানিতে পারে না, তাহাদিগকে প্রথমে সেইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিইয়া, শেষ বলিলে যে তোমরা এই প্রতিজ্ঞার জন্য বাধ্য, ইহা ভঙ্গ করিলে তোমাদিগের পরিণাম অনন্ত নরক। ইহা যে কিরূপ যুক্তি, এবং কিরূপ আধ্যাত্মিক বিবাহ, তাহা যুক্তিদাতাগণই বলিতে পারেন।

এস্থলে অক্ষয় বাবু হয়ত বলিতে পারেন যে, পরিণত বয়সে অর্থাৎ যে বয়সে দম্পতী বিবাহ-প্রতিজ্ঞা বুঝিতে সমর্থ হয়, সেই বয়সে বিবাহ দিলেই ত এই আপত্তি খণ্ডিত হইল। আমরা বলি যে, তাহা নয়। পরিণত বয়সে বিবাহ হইলেও যে আত্মার মিল হইবে, তাহার অর্থ কি? আত্মায় আত্মায় মিল, বুদ্ধি, বয়স, বা শিক্ষা, কিছুরই উপর নির্ভর করে না, তাহা একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, জগতে বড় দুর্ল্লভ সামগ্রী! সুতরাং অক্ষয় বাবু যে হিন্দু বিবাহ মাত্রেই আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান দেখিয়াছেন, তাহা কেবল কল্পনায় মাত্র, বাস্তবিক জীবনে দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং হিন্দু বিবাহের যে আধ্যাত্মিকতার অনুরোধে, তাঁহার মতে, হিন্দু নারীর স্বামীর পরলোক প্রাপ্তিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার অধিকার নাই, হিন্দু বিবাহে যখন সেই আধ্যাত্মিকতারই অভাব, তখন বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ যে ধর্ম্ম বহির্ভূত কার্য্য নহে, তাহা বলা অতিরিক্ত মাত্র। ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

নব-জীবন ও বিধবা বিবাহ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবের উপ-সংহার স্থলে বলিয়াছি যে প্রত্যেক বিবাহকে আধ্যাত্মিক বিবাহ বলিলে, আধ্যাত্মিক বিবাহের অবমাননা করা হয়। যে বিবাহে আত্মার সহিত আত্মার যোগ,—প্রাণের সহিত প্রাণের মিল, সংসারে তাহা বাস্তবিকই বড় দুর্লভ সামগ্রী; সহস্রেরও মধ্যে একটী দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। বিবাহের পর হইতেই, অনেক দম্পতীকে জীবনের অবশিষ্ট কাল, গুরুতর মানসিক যন্ত্রণায় অতিবাহিত করিতে হয়। আত্মার সহিত আত্মার যোগ দূরে থাকুক, পরস্পরের রুচি ও প্রবৃত্তির পার্থক্য বশতঃ, তাঁহাদিগের বিবাহ-সম্বন্ধ ভয়ঙ্কর ক্লেশের কারণ হইয়াই উঠে। এরূপ অবস্থায় উদ্বাহ-বন্ধনের উচ্ছেদই, পরস্পরের পক্ষে শান্তি-জনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরে যখন মৃত্যু আসিয়া চির দিনের জন্য তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে, তখন কি বলিব যে, যাঁহারা এতদিন পর্য্যন্ত পতিপত্নী রূপে, অশান্তিতে, জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আজি মৃত্যুর পর তাঁহারা আদর্শ দম্পতীরূপে শান্তি রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন? এরূপ বিশ্বাস ত কোন মতেই সুসঙ্গত হইতে পারে না। আত্মা যে অবিনশ্বর, তাহাত স্বীকার করি; যদি একবার একটী আত্মার সহিত অপর একটী আত্মার যোগ হয়, তবে তাহাতে যে বিয়োগ ঘটে না, তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু জগতে যখন আত্মার সহিত আত্মার যোগ এত দুর্লভ, দেখিতে পাই না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তখন কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, বিবাহ মাত্রই আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান; এবং তজ্জন্য হিন্দু রমণীর পতি বিয়োগের পর পুনর্ব্বার বিবাহে অধিকার নাই?

(২) "হিন্দু রমণীর বিবাহ একটী কুলের সহিত, বিশেষ পুরুষ কেবল পাত্র মাত্র। তিনি একবার যে কুলে গৃহীতা, নীতা ও পরিণীতা হইয়াছেন, কোন প্রকারেই আর তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। কুলত্যাগিনী, কুলটা, ব্যভিচারিণী, হিন্দুদিগের অভিধানে একই পর্য্যায় ভুক্ত।"

আমরাও স্বীকার করি যে, বিবাহ পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে নহে; তাহারা কেবল বিশেষ ব্যক্তি মাত্র। বিবাহ একটী কুলের সহিত অপর একটী কুলের; একটী কুল আদান প্রদান দ্বারা অপর একটী কুলের সহিত মিলিত হইয়া যায়; পরস্পরের শোণিত একত্রিত হইয়া, দুইটী বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে একটী অভিনব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া কখন স্বীকার করিতে পারিনা যে, পতি বিয়োগের পর পত্যন্তর গ্রহণকারিণী রমণী, কুলটা। বিবাহের পূর্ব্বে কুমারী অবস্থায়ত রমণী পিতৃকুলে বাস করেন; পিতার কুলই তখন তাঁহার কুল;—ক্রিয়া, কর্ম্ম, জন্ম, মৃত্যু, সকল বিষয়েইত তিনি পিতৃকুল হইতে সম্পূর্ণ রূপে অনন্য। তবে বিবাহের পর যখন তিনি পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া, "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহম্" বলিয়া, পতিকুলে আশ্রব গ্রহণ করিলেন, তখন তিনিও ত সে অবস্থায় কুলত্যাগিনী; তবে কুলটা নহেন

কেন? অক্ষয় বাবু কুলটা শব্দের কি এই রূপই অর্থ বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন? না উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজের ইচ্ছামত একটা অর্থ করিলেন? পতি লইয়াই রমণীর পতিকুলের সহিত সম্বন্ধ, এবং পতি অবর্ত্তমানে সে কুল হইতে তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। কুমারী অবস্থায় পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া, বিবাহের পর পতিকুলে আসিবার তাঁহার যেমন অধিকার; বৈধব্য দশা ঘটিলে পত্যন্তর গ্রহণ করিবার সময়, ভবিষ্যত্ পতির কুল গ্রহণেও তেমনি অধিকার। ইন্দ্রিয় পিপাসা নিবৃত্তির জন্য, বা স্বার্থ বিশেষ সিদ্ধির নিমিত্ত, কুলত্যাগই নিন্দিত; এবং এইরূপ কুল-ত্যাগিনী রমণীরই নাম কুলটা। কুলত্যাগ মাত্রই নিন্দিত বা ঘৃণাবহ নহে। যখন পত্যন্তর গ্রহণই শাস্ত্র ও ধর্ম্ম সঙ্গত, তখন ভবিষ্যৎ পতিরকুল গ্রহণ যে দোষাবহ নহে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অক্ষয় বাবু কুলটা শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোনও কথা বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু তিনি যে, স্বেচ্ছা ক্রমে এবং নিজের জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই, সমাজের এক শ্রেণীর লোকের উপর, এরূপ তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি; বিবাহেচ্ছু বিধবাগণকে প্রকারান্তরে কুলটা ও ব্যভিচারিণী বলিয়া, তিনি যে কেবলই আপনার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার ও অনুদারতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নীচত্বেরও যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। বিবাহার্থিনী বিধবাগণের প্রতি এইরূপ কটূক্তি বর্ষণ করিবার তাঁহার কোন অধিকার ছিল না; কিন্তু যাহারা কটূক্তি-প্রিয়, তাঁহারা প্রায়ই বড় নির্লজ্জ; সুতরাং অক্ষয় বাবুকে এ বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

৩। "হিন্দু বিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যাই অবলম্বনীয়। হিন্দুনারী জানেন কেবল একং ও অদ্বিতীয়ং; কাযেই তিনি পতিচারিণী হইলেই একচারিণী; সেই পতি যখন ব্রহ্মে লীন হইলেন, কাযেই তিনি ব্রহ্মচারিণী"।

এই যুক্তিটীর সম্বন্ধে আমাদের দুইটী বক্তব্য আছে। প্রথম কথা এই যে, হিন্দু বিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যাই অবলম্বনীয় কেন? এবং দ্বিতীয় কথা এই যে, পতির ব্রহ্মেলীন হওয়া, কি প্রত্যেক বিধবাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে এবং সেই জন্য ব্রহ্মচারিণী হইতে হইবে?

অক্ষয় বাবু এই যুক্তি প্রদর্শনের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা না করে কে? কিন্তু সেই প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে যদি তিনি ব্রহ্মচর্য্যের একটী প্রকৃত লক্ষণ, ও তাহা কিরূপ অবস্থায় এবং কিরূপ ব্যক্তির দ্বারায় অনুবর্ত্তনীয়, তাহা বিবৃত করিতেন, তাহা হইলেই বড় ভাল হইত। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ আমরা কি বুঝিব? অভিধান যাহা বলে তাহাত এইঃ—ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুন বর্জ্জনং তাম্বুলাদি বিবর্জ্জনঞ্চ। যথা প্রচেতাঃ।

তাম্বুলা ভ্যঞ্জনং চৈব কাংস্য পাত্রেচ ভোজনং।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিবর্জ্জয়েৎ।
একাহারঃ সদা কার্য্যঃ নদ্বিতীয়ঃ কদাচন।
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং।
গন্ধ দ্রব্যস্য সম্ভোগোনৈব কার্য্য স্তয়া পুন
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুস্তিল কুশোদকৈ
বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষং নিয়মঞ্চরেৎ
স্নানং দানংতীর্থ যাত্রাং বিষ্ণোর্নাম গ্রহং মুহঃ
ইতি শুদ্ধিতত্ত্বম্।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম উদ্দেশ্য মৈথুন বর্জ্জন। এবং এই উদ্দেশ্য যাহাতে সংসাধিত হয়, তজ্জন্যই একাহার প্রভৃতির উপদেশ। বিধবার খাদ্যাখাদ্য ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের নিম্নলিখিত উপদেশটীও এই যুক্তিকে আরও দৃঢ় করিতেছে।

"পর্য্যঙ্ক শায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং
যানন্যারোহণং কৃত্বা বিধবা নরকং ব্রজেৎ॥
ন কুর্য্যাৎ কেশ সংস্কারং গাত্র সংস্কার মেবচ।
কেশ বেণী জটা রূপং তৎক্ষৌরং তীর্থকং
বিনা॥
তৈলাভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত ন হি পশ্যতি দর্পণং।
মুখঞ্চ পরপুংসাঞ্চ যাত্রাং নৃত্যং মহোৎসবং॥
নর্ত্তকং গায়নঞ্চৈব সুবেশং পুরুষং শুভং।
ইতি ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে
৮৩ অধ্যায়॥

এক্ষণে আমরা অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, এই কি ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত লক্ষণ? এসকল ত দেখিতেছি, ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য উপদেশ। যাহাতে হৃদয়ে বিলাসস্পৃহা না আসে, ইন্দ্রিয় পিপাসা না জন্মে, শরীরকে বশীভূত রাখিয়া, দুর্দ্দমনীয় রিপু সকলকে দমন করিয়া রাখিতে পারা যায়, এ উপদেশ ত তাহারই জন্য প্রদত্ত। পাছে বিধবার হৃদয়ে, ইন্দ্রিয়পিপাসা জন্মে, প্রবৃত্তির পীড়নে পাছে সে কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হয়, এ উপদেশ ত সেই জন্য। পাপ হইতে রক্ষা মাত্রই এই উপদেশের লক্ষ্য, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ ত আরো মহত্তর হওয়া কর্ত্তব্য, তাহার বিধানত আরও প্রশস্ত, আরও সার্ব্বলৌকিক হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয় সংযম কেবল বিধবার কর্ত্তব্য কেন; প্রত্যেক নরনারীরইত অবশ্যোচিত কার্য্য; তবে এ নিয়ম প্রতিপালন করিতে কেবল বিধবাগণই বাধ্য কিজন্য?

অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন—"যে হিন্দু বিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয়।" শাস্ত্রে ত ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ, এবং পুনর্ব্বার বিবাহ, বিধবার পক্ষে এই তিনই বিধান আছে, তবে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয় কি জন্য? ইহার উত্তরে অক্ষয় বাবু অনেক বাগাড়ম্বরের পর বলিয়াছেন যে, নিষ্কাম ধর্ম্মেরই অনুসরণ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য; ব্রহ্মচর্য্য সেই নিষ্কাম ধর্ম্ম এবং সেই জন্যই বিধবার একমাত্র অবলম্বনীয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য যে নিষ্কাম ধর্ম্ম, হিন্দু শাস্ত্র কোবিদ এবং হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক অক্ষয় বাবু, তাহা কোন্ হিন্দু শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছেন? ব্রহ্মচর্য্যের ফলত আমরা মনুসংহিতায় এইরূপই অবগত হই।

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি।" মনুসংহিতা ৫।১৬০॥

সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, অপুত্রা হইলেও স্বর্গে গমন করিবেন।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য এবং ফল স্বর্গ; কিন্তু যাহার কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহাত নিষ্কাম ধর্ম্ম হইতে পারে না; তবে ব্রহ্মচর্য্য কি রূপে নিষ্কাম ধর্ম্ম হইবে? সকাম এবং নিষ্কাম ধর্ম্মের যাহা লক্ষণ, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যোহি বেদাধিগমঃ কর্ম্ম-যোগশ্চ বৈদিকঃ॥"
মনু ২ অ ২॥

কর্ম্ম মাত্রই কামনার বিষয়, স্বর্গাদি ফলাভিলাষ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান অতি গর্হিত, যে হেতু তদ্রূপ কর্ম্ম করিলে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞান সহকারে বেদবোধিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়॥

"সঙ্কল্পমূলঃ কামোবৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্প সম্ভবাঃ।
ব্রতানিয়ম ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃস্মৃতাঃ॥"

মনু ২য় অঃ ৩।

এই রূপ কর্ম্মদ্বারা আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, এইরূপ বুদ্ধিকে সঙ্কল্প বলা যায়, এই সঙ্কল্পের পর তাহাতে ইচ্ছা জন্মে, অনন্তর তাহার অনুষ্ঠান হয়,এইরূপে যজ্ঞ সকল সঙ্কল্প সম্ভব হইয়া থাকে, আর ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত ও গুরু শুশ্রূষাদি নিয়ম সকল সঙ্কল্প জন্য হয়।

"তেষু সম্যগ্বর্ত্তমানো গচ্ছত্য মরলোকতাং।
যথা সঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান কামান্ সমশ্নুতে॥

মনু ২য় অঃ ৫॥

ফলাভিলাষ শূন্য হইয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং স্বভাবতই সকল অভিলাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, যে কর্ম্ম কোন উদ্দেশ্য বা কোন ফলাভিলাষের জন্য হয়, তাহা কাম্য কর্ম্ম, এবং ফলাভিলাষ শূন্য হইয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম, এবং মোক্ষ প্রাপ্তির অনুকূল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য স্বর্গ;—সুতরাং অক্ষয় বাবু সহমরণ ও পুনর্ব্বিবাহকে যে বর্জ্জনীয় কাম্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্যও সেই জাতীয়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কাম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম; এবং তজ্জন্যই বিধবার একমাত্র অবলম্বনীয়, এযুক্তির সারবত্তা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। যখন ব্রহ্মচর্য্য এবং পুনর্ব্বার বিবাহ এই উভয়ই শাস্ত্রানুসঙ্গত এবং ধর্ম্মানুমোদিত, তখন ইচ্ছা করিলেই বিধবা এ দুইএর যে কোনটী অবলম্বন করিতে পারেন। ব্রহ্মচর্য্যই একমাত্র অবলম্বনীয়, পত্যন্তর গ্রহণ অশাস্ত্র এবং অধর্ম্ম, একথার কোনও অর্থ নাই। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অক্ষয় বাবুর দ্বিতীয় কথা এই যে, পতি যখন ব্রহ্মেলীন হইলেন, তখন ব্রহ্মচারিণী হওয়াই বিধবার কর্ত্তব্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, পতি মাত্রই কি মৃত্যুরপর ব্রহ্মে লীন হইবেন? এবং প্রত্যেক বিধবাকেই কি বিশ্বাস করিতে হইবে যে, তাঁহার পতি ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন? এমন অনেক বিধবা আছেন, যাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদিগের পতি জীবনে যেরূপ দুষ্ক্রিয়াসক্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রহ্মেলীন হওয়া দূরে থাকুক, হিন্দুশাস্ত্র মতে কৃমিযোনিপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। এই সকল বিধবার পক্ষে, তাহা হইলে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? অক্ষয়বাবু হয় ত বলিবেন যে, পতি স্বর্গে অথবা নরকে থাকুন্ ক্ষতি নাই, বিধবার ব্রহ্মচারিণী হওয়াই কর্ত্তব্য। আমরা তাহার উত্তরে বলিব যে, তাহা যদি বলেন, তবে কেবল বিধবারই কর্ত্তব্য কেন, প্রত্যেক নর নারীরই, ব্রহ্মচারী অথবা ব্রহ্মচারিণী হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পতি ব্রহ্মেলীন হইয়াছেন, যদি এইমাত্র কারণেই ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয়, তাহা হইলে ত দেখিতে পাই, অনেক বিধবাকে কুনিগত চিন্তাতেই জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। আমরা এই পর্য্যন্ত বুঝি যে, ব্রহ্মচর্য্য যদি অনুসরণীয় হয়, তবে তাহা সধবা, কুমারী, বিধবা, সকলেরই পক্ষে সমান।

ব্রহ্মচর্য্য সকাম অথবা নিষ্কাম ধর্ম্মই হউক, পুনর্ব্বিবাহ অপেক্ষা, শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট কর্ম্মই হউক, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। এমন যুক্তি ত দেখিতে পাই না, যাহা হিন্দু শাস্ত্রের কোন

না কোন স্থলে সমর্থিত না হইয়াছে, তবে শাস্ত্রের কথা অনর্থক। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, শাস্ত্রকার এই বহু প্রশংসিত, বহু ফলপ্রদ ধর্ম্মটী, কেবলই বিধবার ব্যবহারের জন্যই রাখিয়া দিয়াছেন কেন? যাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়, তাহাত সকলেরই নিকট সমান; যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জানি, তাহা করিবার জন্যত সকলেরই ব্যগ্র হওয়া কর্ত্তব্য; তাহা করিতে ত সকলেরই অধিকার আছে; তবে কেবল বিধবার উপর এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম চালাইতে চান কি জন্য? এই একদেশদর্শিতা এবং অত্যাচার দেখিয়া, আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, হিন্দুশাস্ত্রে বিধবার যে ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অতি দূরতর, কিন্তু শারীরিক প্রবৃত্তি বিশেষের প্রতিরোধই এই ব্রহ্মচর্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ব্রহ্মচর্য্য বিধবার আত্মার উন্নতির জন্য নয়, তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিশেষের নিরোধের জন্য। পুরুষকে ক্লীবে পরিণত করিবার জন্য, পূর্ব্বে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিবার রীতি ছিল, স্ত্রী জাতির পক্ষে সে সকল উপায় অপ্রযোজ্য। এই একদেশব্যাপী, শ্রেণী-বিশেষ প্রযোজ্য ব্রহ্মচর্য্য, বিধবাকে ক্লীবে পরিণত করিবার উপায়। হয়ত অক্ষয় বাবু এস্থলে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, যাহাতে ইন্দ্রিয় সংযম হয়, তাহা কি ব্রহ্মচর্য্য নয়? আমরা বলি যে, তাহা ব্রহ্মচর্য্য না হইলেও তাহার আনুষঙ্গিক, নিত্য সহচর, অথবা অবশ্যম্ভাবী ফল বটে। কিন্তু ইন্দ্রিয় সংযমের নামই যদি ব্রহ্মচর্য্য, তবে তাহাকে নিষ্কাম ধর্ম্ম না বলাই কর্ত্তব্য।

নিষ্কাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগের এখনও একটু বক্তব্য আছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিলেই আমরা বুঝিব যে, যে ধর্ম্মে উদ্দেশ্য নাই, স্বার্থ নাই, কামনা নাই, যে ধর্ম্ম কেবলই ধর্ম্মের জন্য, সেই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা ত আর কোন মহত্তর লক্ষ্য হইতে পারে না। যদি আমি কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সত্য কথা বলি, তবেত সে সত্যের তেমন গৌরব নাই। কিন্তু যদি আমি কেবলই সত্যের জন্যই সত্য কথা বলি, তবেই আমি সত্যের প্রকৃত গৌরব বুঝিয়াছি। সেই জন্যই বলি যে, ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, স্বাধীনতার প্রয়োজন। যে ধর্ম্মে স্বাধীনতার অভাব, তাহা কখনই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম হইতে পারে না। যদি কেহ রাজদণ্ডের ভয়ে চৌর্য্যাচরণ না করে, তবে কি বলিব যে, সে ব্যক্তি বড় ধার্ম্মিক, তাহার ধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্ম। যদি এমন কোন রাজ নিয়ম হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাঁহার উপার্জ্জনের অর্দ্ধাংশ দরিদ্রদিগকে দান করিতে হইবে; এবং না করিলে নিয়ম ভঙ্গকারীকে দ্বীপান্তরিত হইতে হইবে; এবং এরূপ অবস্থায় রাজদণ্ডের ভয়ে, যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন আপনার উপার্জ্জনের অর্দ্ধাংশ দরিদ্রদিগকে দান করেন; তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে তিনি বড় দানশীল, তাঁহার ধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্ম। স্বাধীনতা না থাকিলে ত নিষ্কাম ধর্ম্ম হইতে পারেনা। কিন্তু বিধবার ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিন্দুমাত্রও স্বাধীনতা নাই। অত্যাচারের ভয়ে, মানসিক নির্ব্বেদে, বিধবা ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন। তাহার জন্য না করিলে সমাজ তাঁহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া ঘৃণা করিবে, আত্মীয়গণ কলঙ্কিনী বলিয়া নির্য্যাতন করিবেন; কিন্তু যদি বিধবাকে স্বাধী-

নতা দিয়া, ব্রহ্মচর্য্য এবং পুনর্ব্বিবাহ এ উভয়ের মধ্যে তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইত, তাহা হইলেই বুঝিতাম যে, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব বুঝিতে সমর্থ। নতুবা বল পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করাইয়া, আমাদিগের বিধবাগণ "কেমনই ক্ষেমঙ্করী, কেমনই নিষ্কামে কার্য্যকরী বলা" অন্তঃসারহীন বাক্যের আড়ম্বর মাত্র।

এস্থলে হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমরা বলিতেছি যে, হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বিধবাই বিবাহ প্রয়াসিনী। আমাদিগের এরূপ উদ্দেশ্য নহে। আমরা জানি যে, হিন্দু সমাজে আদর্শ বিধবার অসদ্ভাব নাই। বিধবাগণের মধ্যে, এমন কি বাল বিধবাগণের মধ্যেও, এমন কেহ কেহ থাকিতে পারেন যে, যাঁহারা আজীবনই পরের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। পতিগত চিন্তায়, প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে তাঁহাদিগের বিরক্তি নাই। কিন্তু কেহ কি অস্বীকার করিতে পারিবেন যে, এরূপ রমণীর সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প? এই রক্তমাংসময় শরীরে, পাপ কলুষময় জগতে, কেমন নিসর্গ পবিত্র দেবতার আবির্ভাবই অসম্ভব। অহরহ আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাই নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। কোথাও তাহার পার্থক্য দেখিলেই বুঝিব যে, তাহা নিয়ম নহে; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। যে প্রেত মূর্ত্তি অবিশ্রান্তই আমাদিগের চক্ষুর উপর ভাসিতেছে, তাহা না দেখিয়া কি যুগান্তরে কোথায় একটী দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া বলিব যে, হিন্দুসংসার শ্মশান নয়, স্বর্গ? অহরহ পূতিগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, এক দিন স্বর্গের সৌরভে মোহিত হইয়া কি বলিব যে, হিন্দু সংসার নরক নয়, নন্দন কানন? সত্যের অনুরোধে আমরা স্বীকার করিতে পারিনা যে, হিন্দু সংসার পবিত্র; হিন্দুশাস্ত্র ন্যায়ানুগত। হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু সমাজের উপর আমরা এইরূপ দোষারোপ করিতেছি দেখিয়া, হয়ত অনেকে একটু ক্ষুব্ধ হইবেন। এখন এইরূপ একটা সম্প্রদায় হইয়াছেন, যাঁহারা বলিতে চান যে, হিন্দুর যাহা কিছু ছিল, সে সকলই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। বিধি, নিয়ম, শাস্ত্র, ব্যবহার, হিন্দুর সকলই উন্নতির চরম সোপানে উঠিয়াছিল। "হিন্দুর জীবন ধর্ম্ম প্রধান" "হিন্দুর সকল কার্য্যই আধ্যাত্মিক" ইত্যাদি নানা কথা এক্ষণে সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা বলি যে, এইরূপ আরোপিত গৌরবে হিন্দুকে গৌরবান্বিত করিবার প্রয়োজন কি? গৌরবের বিষয় ত তাঁহাদিগের যথেষ্টই ছিল; অপর কোন জাতির তেমন ছিল? তবে এই সকল আরোপিত প্রশংসা কি জন্য? দিবালোককে উজ্জ্বল করিবার জন্য দীপালোকের প্রয়োজন হয় না। হিন্দু নিজের তেজেই তেজস্বী, তিনি কল্পিত জ্যোতির প্রার্থী নহেন। এসম্বন্ধে আমাদিগের মত এই যে, আমরা হিন্দুর যাহা প্রশংসার কথা আছে, তাহাত মুক্ত কণ্ঠেই বলিব, কিন্তু দোষ দেখিলেই বা বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? আমরা সেই জন্যই বলি যে, হিন্দুর জীবন যেমনই ধর্ম্ম প্রধান, তেমনই অধর্ম্ম প্রধান; যেমনই আধ্যাত্মিক, তেমনই আধিভৌতিক; যেমনই পারলৌকিক, তেমনি পার্থিব; যেমনই পরহিত-পরায়ণ, তেমনই স্বার্থ—পূর্ণ। নচেৎ "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা-

ভূতানি" এই স্নেহ নিস্যন্দিনী বাণী যে জাতির কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল, তাহারই ব্যক্তি বিশেষ "শূদ্রের জীবন জীবনই নয়" একথা বলিতে সাহস করিবেন কেন। যদি এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম, স্ত্রী জাতির ন্যায় পুরুষেরও উপরে বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে বুঝিতাম যে, বিধি দাতা প্রকৃত হৃদয়বান্। কিন্তু বিধি, নিয়ম, ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, সকলই কি হতভাগিনী অবলাগণের জন্য? অশীতিবর্ষবয়স্ক পুরুষের দার গ্রহণ ধর্ম্মানুমোদিত ও শাস্ত্র-সম্মত, কিন্তু অষ্টম বর্ষীয়া বিধবার পুনর্ব্বিবাহ অধর্ম্ম পূর্ণ ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। এই যদি ধর্ম্ম, এই যদি শাস্ত্র, তবে অধর্ম্ম, অশাস্ত্র কি, জানি না। এই কঠোর শাস্ত্র-প্রণেতা এবং তাহার অনুমোদকগণ যদি আর্য্য সন্তান, তবে অনার্য্য কে, বলিতে পারি না! কিন্তু এ নিয়মের কি পরিবর্ত্তন হইবে না? অশাস্ত্র ব্যবহারও শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে, শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিও ত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কেবল এই দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার কি ঘুচিবে না? কিন্তু ভারত সন্তান আজি নিদ্রিত, অনাথার আর্ত্তনাদ তাঁহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারে না; তবে এ সর্ব্বনাশিনী ব্যাধির প্রতিকারের উপায় কোথায়?

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আমাদিগের শেষ কথা এই যে, যে নিয়ম লোকে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, অথবা তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমরা স্বীকার করি যে, ধর্ম্ম কৃচ্ছ্র সাধ্য হইলেও অনুসরণীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া কখনও স্বীকার করিতে পারি না, যে কেবল কৃচ্ছ্র-সাধ্য ধর্ম্মই ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম, ধর্ম্মই নহে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ মানব প্রকৃতি বুঝিতেন; তাঁহারা জানিতেন যে, সকলের মানসিক বৃত্তি সমান নহে। যাহা একের পক্ষে উপযুক্ত, অন্যের পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। একের নিকট যাহা বড় কোমল, বড় সুগম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, হয় ত অপরের নিকট তাহা বড় কঠোর, বড় দুর্গম হইতে পারে। তাঁহারা সেই জন্যই বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ, এবং পুনর্ব্বিবাহ, এই তিনেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এবং অবস্থা ও প্রবৃত্তি অনুসারে এই তিনের যে কোনটীই অনুসরণীয়, এইরূপই আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বাবুর সাহস শত গুণ অধিক, তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন, হিন্দু বিধবার পক্ষে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বনীয় এবং ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগিনী বিবাহেচ্ছু রমণী কুলটা এবং ব্যভিচারিণী। অক্ষয় বাবুকে শত সহস্র ধন্যবাদ! তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির জন্যই আমরা এতদিন তাঁহাকে অতুল্য ভাবিয়া প্রশংসা করিতাম; এত দিন পরে বুঝিলাম যে, শাস্ত্রার্থের বিপরীত করণে এবং যুক্তির শিরশ্ছেদনেও তিনি অদ্বিতীয়; বীর ক্রিটানিকস ভিন্ন তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা সাহিত্য জগতে আর নাই।

৪। "হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য মুক্তি। বিবাহ মোক্ষ লাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী। বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের অবলম্বন।"

এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য যে, বিবাহ মাত্র অথবা বিবাহ বিশেষ, মোক্ষ লাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী? যদি বিবাহ মাত্রই হয়, তবে মোক্ষ লাভেরত এমন সহজ উপায়, সরল পথ আর দেখিতে

পাই না। সহস্র দুষ্কর্ম্ম, সহস্র অপরাধ
করিয়াও ত, তাহা হইলে বিবাহের বলেই
মুক্তি লাভ হয়। মোক্ষ লাভই ত জীবাত্মার
উদ্দেশ্য; বিধি, নিয়ম, কর্ম্ম, ব্রত, হিন্দু শাস্ত্র
মতে সকলই ত মোক্ষ লাভের জন্য। যখন
বিবাহ মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎ-
কৃষ্ট প্রণালী, তখন হতভাগিনী বিধবাগণকে
এমন সহজ পথ হইতে, এমন "ক্লাই কাত-
লার রাস্তা" হইতে, ব্রহ্মচর্য্যরূপ এমন
দুর্গম পথে (ব্রহ্মচর্য্য ত মোক্ষের অপেক্ষা
অধিকতর উৎকৃষ্ট কোন পদার্থ দিতে পারে
না) "এমন চুনা গলিতে" পাঠাইতে চান
কেন? রহস্য ছাড়িয়া তর্ক করিতে হইলেই
তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিবাহ
মাত্রই মোক্ষ লাভের সুপ্রশস্ত ও সর্ব্বোৎ-
কৃষ্ট প্রণালী নহে; বিবাহ বিশেষ মাত্র।
এখন বুঝিতে হইবে যে, বিবাহ মোক্ষ-
লাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী
কেন, এবং তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে
পারিব যে, কিরূপ বিবাহ, মোক্ষ লাভের
সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। আমাদিগের শাস্ত্রকার
গণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, গার্হস্থ্যা-
শ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ।

"চতুর্ণামাশ্রমানাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।"

গৃহিণী এই গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠ অবল-
ম্বন; সেই জন্যই বিবাহ মোক্ষ লাভের
সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী। কিন্তু গৃহী হইলেই
অথবা গৃহিণী পাইলেই উদ্দেশ্য লাভ হইল
না, তাহার জন্য আরও একটু স্বতন্ত্র শিক্ষার
প্রয়োজন। মানুষ প্রথমে আপনাকেই ভাল-
বাসে, স্বভাবত স্বার্থপর প্রাণ, প্রথমে
নিজের জন্যই ব্যগ্র হয়, পরের জন্য ভাবি-
বার অবসর পায় না। বিবাহের পর হইতে
তখন আর এক জনের জন্য চিন্তা করিতে
হয়; ক্রমে একজন হইতে দুইজন, দুইজন
হইতে পাঁচজন, ক্রমে মনুষ্য সমাজ, অব-
শেষে সমস্ত জগতকে ভাল বাসিবার শিক্ষা
লাভ হয়। অক্ষয়বাবু নিজেই ইহা স্বীকার
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রথমে
আপনার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি,
তাহার পর পারিবারিক বা সাংসারিক
উন্নতি, তাহার পর সামাজিক উন্নতি, সর্ব্ব
শেষ ঐশ্বরিক উন্নতি।" "বিশাল হইতে
বিশাল তরে, বিশালতর হইতে বিশালতমে
পরিণতি অথচ বিলয়, ইহাই জগতের
নিয়ম।" তবেই স্বীকার করিতে হইল যে,
সামাজিক উন্নতির জন্য, আত্মার সম্প্রীতির
জন্য, ঐশ্বরিক উন্নতির জন্য, (প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য
সাধনের জন্য) "ক্রমের আবশ্যক করে।"
এই কলুষময় সংসারে, পাপ প্রলোভনময়
জগতে, দুর্ব্বল নর-নারীর পক্ষে পদ্ধতি
ব্যতিরেকে ব্রহ্মচর্য্য সাধন অসম্ভব। ইহার
জন্য সহায় আবশ্যক। পতনোন্মুখ আত্মাকে
কেশে ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে,
এরূপ ব্যক্তির প্রয়োজন। এইবার অক্ষয়
বাবুর নিজের কথায় ও নিজের যুক্তি বলেই,
আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। যখন
সুশিক্ষিত, সৎসংসর্গ-প্রাপ্ত, সংস্কার-পরি-
চিত ব্যক্তির জন্য, ব্রহ্মচর্য্য সাধনে সহায়
আবশ্যক; গৃহী হইবার জন্য বিবাহের প্রয়ো-
জন; তখন অশিক্ষিতা, সংসার-জ্ঞান-শূন্যা,
বিধবার পক্ষে যে বিবাহ একান্তই প্রয়োজ-
নীয়, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারিবেন?
যখন ব্রহ্মচর্য্যের জন্য আমাদিগের পক্ষেই
এক ক্রমের প্রয়োজন, তখন নিঃসহায়া
বিধবাকে কেমন করিয়া বলিব যে, হত-
ভাগিনি, তোমাকে শিখিতে দিব না, পথ
দেখাইয়া দিব না, কিন্তু তুমি সেই বাক্য—

মনের অগোচর, যাহাকে শুক সনাতন ভাবিয়া থাক নাই, সেই দেবতাকে হৃদয়ে লইয়া তৃপ্ত থাক? বিধবা হইল বলিয়াই কি তাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত, এবং গ্রাহিণী শক্তি বিস্তৃত হইল? তাহাত নয়। বিবাহ কুমারীর পক্ষেও যেমন শিক্ষার জন্য, বিধবার জন্যও ত তাই। যদি কুমারী বিশ্বপ্রেম শিখিবার জন্য, জগৎকে ভাল বাসিবার জন্য বিবাহ করেন, তবে বিধবার বিবাহে সেই উদ্দেশ্য নাই কেন? "বিবাহ মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী" স্বীকার করিয়াও, জানি না অক্ষয় বাবু তবে কোন্ যুক্তি অনুসারে বলিলেন, "স্বামীর পরলোক গতির পর যে রমণী বিবাহ করেন, তিনি আপনার জন্যই বিব্রত, তাও আবার কেবল নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থ করিবার জন্য উৎসুক। সুতরাং তাহার কার্য্য কাম্য মধ্যে ঘোরতর কাম্য।"

৫। "উচ্চতর সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করা একরূপ অসম্ভবের সম্ভবনা করা। হিন্দুর আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস দেখিলে তাহা বুঝা যায়। ত্রিশ বৎসরের আইন খানির দুর্দ্দশা দেখাইয়া একথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হইয়াছে বলিলেও চলে।"

বোধ হয় বিধবা-বিবাহ-আইনের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া অক্ষয় বাবু প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা নাই। থাকিলে আইন খানির এত অপ্রচলন হইবে কেন? যদি আবশ্যকতা থাকিত, তাহা হইলে আইন থাকা সত্ত্বেও, হিন্দু বিধবা এইরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেন না; অবশ্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিবাহার্থিনী হইতে পারিতেন। আইনের অপ্রচলন দেখিয়া অগত্যাই স্থির করিতে হইবে যে, হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহে অভিলাষ নাই। কিন্তু অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, সমাজ সংস্কারের আবশ্যকতা কি প্রচলিত বিধি বিশেষের প্রচলন বা অপ্রচলনের উপর নির্ভর করে? সংস্কারক ও গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন যে সংস্কার আবশ্যক, সেই মর্ম্মে একটী আইন প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু সমাজ প্রয়োজন সত্ত্বেও, আইন পাইয়াও, নানা কারণে তদনুসারে কার্য্য করিতে সাহসী হইল না; তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, সমাজে সে আইনের প্রয়োজন নাই? আইনের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিবার সময় অক্ষয় বাবুর ভাবা উচিত ছিল যে, আইন করিয়াছিল কে? গবর্ণমেণ্টেরত আর বলপূর্ব্বক তাহা প্রচলিত করিবার অধিকার নাই; আমি চুরি করিলে গভর্ণমেণ্ট আমাকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু যদি আমার প্রতিবাসী অন্নাভাবে মরিয়া যায়, আর আমি তাহা দেখিয়াও তাহাকে একটী পয়সা সাহায্য না করি, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কি আমাকে বাধ্য করিয়া তাহাকে সাহায্য করাইতে পারেন? বিধি হইল যে, বিধবার বিবাহ অন্যান্য বিবাহের ন্যায় আইন-সঙ্গত, পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবার পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হইবেন; কিন্তু বিধবাকে বিবাহ করিতেই হইবে, গবর্ণমেণ্ট ত আর একথা বলিতে পারেন না। তবে আইনের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া লাভ কি? হয় ত অনেকে এস্থলে বলিতে পারেন যে, লোকে যদি আইন গ্রহণ করিতেই না পারিল, তবে সে আইনের প্রয়োজন কি? আমরা বলি, প্রয়োজন আছে। আইন যদি ন্যায়সঙ্গতই হয়, তবে তাহা সহস্র বৎসর অনাদরে, অযত্নে ও

অবস্থার সহিত রক্ষিত হইলেও ক্ষতি নাই। মনে করুন, লর্ড সল্‌সবরি নিয়ম করিলেন, ঊনবিংশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক যে কোন ব্রিটীশ প্রজাই সিভিল সারভিষ পরীক্ষা দিতে পারিবেন। নানা কারণে ভারতবাসী কয়েক বৎসর এই পরীক্ষা দিতে পারিল না; তখন যদি সল্‌সবরি বলেন যে, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে সিভিলসারভিষের প্রচলনের চেষ্টা করা একরূপ অসম্ভবের সম্ভবনা করা, হিন্দুর আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস দেখিলেই তাহা বুঝা যায়, ত্রিশ বৎসরের আইন খানির দুর্দ্দশা দেখাইয়া একথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হইয়াছে বলিলেও চলে; তখন তাহা কেমন শুনায়? "যখন এই কয় বৎসরের মধ্যে ভারতবাসী সিবিল্ সারবিষ পরীক্ষা দিতে পারে নাই, তখন তাহাদিগের এ আইনের প্রয়োজন নাই," একথা শুনিলে আমরা কি মনে করি? যিনি সহৃদয় এবং চিন্তাশীল, তিনি ভাবিবেন, ভারতবাসী পরীক্ষা দেয় নাই কেন; পরীক্ষা দিবার জন্য তাহাকে কত বাধা, কত বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়, সে কথা তাঁহার মনে পড়িবে। অক্ষয় বাবু ত একজন সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ; তিনি কি জানেন না যে, বিবাহার্থিনী বিধবাকে হিন্দুসমাজে কত ক্লেশ, ও কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়? তবে বিধবা কেমন করিয়া আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? এরূপ অবস্থায় বিধবা বিবাহ আইনের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া হিন্দু-বিধবা বিবাহ-প্রার্থিনী নয়, একথা বলা অক্ষয় বাবুর কর্ত্তব্য হয় নাই। এসম্বন্ধে আমাদিগের আরও একটু বক্তব্য আছে, অক্ষয় বাবু বলিতে চাহিয়াছেন যে, বিধবাগণ বিবাহ প্রার্থিনী নন, কিন্তু সে বিষয়ে কি কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে? যদি পিতা মাতা আপন আপন বিবাহযোগ্য কুমার অথবা কুমারীর ন্যায়, বিধবা দুহিতারও বিবাহের জন্য ব্যগ্র হইতেন, কুমারীর বিবাহ যেমন আবশ্যক, বিধবার পক্ষেও তেমনি আবশ্যক, একথা ভাবিয়া দেখিতেন, এবং সে সময় যদি বিধবা বলিত যে, আমার বিবাহের প্রয়োজন নাই, তাহা হইলেই আমরা বুঝিতাম যে, অক্ষয় বাবুর কথা প্রকৃত। কিন্তু সেই রূপ না করিয়া, কৌশলে, নির্য্যাতনে, বা প্রলোভনে, তাহাকে নিস্তব্ধ রাখিয়া, শেষ যদি বলেন "যে, বিধবা বিবাহার্থিনী নয়, তাহার প্রমাণ বিধবা বিবাহ আইনের দুর্দ্দশা" তবে সে যুক্তিকে আমরা কোন মতেই যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যদি পুনর্ব্বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য, এই উভয়ই বিধবার জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকিত, তাহা হইলে বিধবার পক্ষেও অত্যাচার হইত না, এবং লোকেও বুঝিতে পারিত যে, বিধবা বিবাহের আইনের প্রয়োজন আছে কি না; এবং এরূপ অবস্থায় যে বিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন, সংসার ছাড়িয়া স্বর্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, আমরা বুঝিতাম যে তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী। কিন্তু তাহা হইলে, হয় ত জগৎ, সাবিত্রী লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে, বিধবা বিবাহ "নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আছেও বটে, থাকিবেও বটে" এ নূতন কথা শুনিতে পাইত না।"

৬। "হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না, হিন্দু মানেন অনুপাত-বাদ। ক খ যখন সমান নহে, তখন তাহারা সমান পাইবেও না, ক যেমন তেমনই ক পাইবে, খ যেমন তেমনই খ পাইবে।"

স্পষ্ট কথায় ইহার অর্থ এই যে, স্ত্রী পুরুষ যখন সমান নহে, তখন তাহাদিগের অধিকারও সমান হইতে পারে না। স্ত্রী নিকৃষ্ট, সুতরাং জগতের দুঃখ, ক্লেশ, দাসত্ব, সকলই তাহার জন্য; পুরুষ উৎকৃষ্ট, সুতরাং সংসারের সুখ, সম্পদ, প্রভুত্ব, সকল বিষয়েই তাহার অধিকার। আরও স্পষ্ট কথায় ইহার অর্থ এই যে, পত্নীর মৃত্যু হইলে, পুরুষ পুনর্ব্বিবাহের অধিকারী; কিন্তু রমণী রমণী বলিয়াই সে অধিকারে বঞ্চিতা। এযুক্তি খণ্ডন করিব কি, শুনিয়াই আমরা বিস্মিত হইয়াছি। একজন শিক্ষিত লোক যে, শত শত লোকের মধ্যে, প্রকাশ্য ভাবে এরূপ যুক্তি সমর্থন করিতে সাহসী হইতে পারেন, ইহাতেই আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। অক্ষয় বাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন যে, "এমন ঘোরতর শয়তানি মত, ধর্ম্মের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা আর হয় না ;" আমরা তাঁহারই ভাষায় বলি, এমন শয়তানি মত, হিন্দু চরিত্রের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা আর কেহ করিতে পারে না।

স্ত্রী পুরুষের অধিকার সমান নহে, অক্ষয় বাবু একথা কোথায় শিখিলেন ? পাশ্চাত্য শিক্ষার কথা নহে, "শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যঃ ফলেসমা" "যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেন দুহিতা সমা"—এ সকল বচন কি তাঁহার মনে পড়িল না ? কিন্তু যাঁহারা সত্যকে অপলাপ করিতে চান, যুক্তির দিকে তাঁহারা চাহিবেন কেন ?

সাম্যবাদ শব্দের অর্থই ন্যায়বাদ এবং অক্ষয় বাবুর অনুপাতবাদ শব্দের অর্থ, অত্যাচার-বাদ বা অন্যায়-বাদ। হিন্দু অনুপাত-বাদী অর্থাৎ অত্যাচার-প্রিয়, একথা অক্ষয় বাবু, এতদিন প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই; কিন্তু তিনি বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া, পরম হিন্দুত্বের পরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার কথায় হিন্দুসমাজ যে দুঃখিত হইবেন না, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ রূপই বিশ্বাস আছে। এক্ষণে আমরা অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, স্ত্রী জাতি যে পুরুষের সঙ্গে সমান নয়, একথার যুক্তি কি ? শারীরিক দুর্ব্বলতাই যদি ইহার কারণ হয়, তবে আর ইংরাজের নিকট সমান অধিকারের জন্য চিৎকার করেন কেন ? মানসিক অথবা বুদ্ধিগত অপকর্ষতার কথাই যদি বলেন, তাহা হইলেও ত ইংরাজ আমাদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। বুঝিতে পারি না যে, যাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় "মানুষ মানুষের সমান" বলিয়া, চিৎকার করিতে চান, সমাজ সংস্কারের দিন তাঁহারা কোন্ প্রাণে বলিতে চাহেন যে, আমি আমার পত্নীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমার পুত্র কন্যার অধিকার, সমান নহে। সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিয়া আসিলাম, "ইংরাজ, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিক্ষা, চরিত্র, ধর্ম্মভাব, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তোমার এমন অধিকার নাই যে, তুমি আমাকে আমার প্রকৃতি-প্রদত্ত আজন্ম-প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পার।" কিন্তু গৃহে গিয়া পত্নীকে বলিলাম, চরিত্রে, স্নেহে, সহিষ্ণুতায়, পরদুঃখ-কাতরতায় তুমি আমার শিক্ষাদাত্রী হইলেও, তুমি দুর্ব্বল বলিয়া, আমার উপর নির্ভর করিয়া আছ বলিয়া, আমি ভিন্ন তোমার আর গতি নাই বলিয়া, তোমাকে তোমার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিব। হিন্দু অনুপাত-

বাদী, এবং এই যদি অনুপাত-বাদের অর্থ হয়, তবে আমরা আবার বলি, এমন শব্দ-জালি মত, হিন্দু চরিত্রের এমন বিকৃত ব্যাখ্যা, অক্ষয় বাবু ভিন্ন আর কেহ প্রচার করিতে সাহস করে না।

অক্ষয় বাবু বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে এবং অপ্রসঙ্গ ক্রমে ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি যে সকল কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, আমরা তাহার আলোচনা করি নাই; করাও আবশ্যক বলিয়া বোধ করি না। তিনি বিবাহেচ্ছু বিধবাগণকে প্রকারান্তরে কুলটা ও ব্যভিচারিণী বলিয়াছেন; বিলাতীয় বিবাহকে "নেড়া নেড়ীর কাণ্ড" নাম দিয়াছেন, বিধবা বিবাহ যে সমাজে প্রচলিত তাহা অতি নিকৃষ্ট ও নীচ সমাজ, তাহাও বলিয়াছেন। ইহার কোন কথায় আমরা বিস্মিত হই নাই। শাস্ত্রের নাম দিয়া তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, পুনর্ব্বিবাহ বিধবার পক্ষে অধর্ম্ম,এবং একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই তাহার অবলম্বনীয়। আইনের কথা উল্লেখ করিয়া, "হিন্দু বিধবা বিবাহার্থিনী নহে" এ মিথ্যাও তিনি প্রকারান্তরে প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের হৃদয়-শূন্যতার সমর্থন করিতে গিয়া, তিনি হিন্দু অনুপাত-বাদী, এই অন্যায় দোষারোপ করিতেও ত্রুটী করেন নাই। এ সকলের কিছুতেই আমরা বিস্মিত হই নাই। কিন্তু তিনি যে হিন্দু বিধবার অবস্থা বর্ণন করিতে যাইয়া, প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া, কতকগুলি অলীক বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথায়, বিধবা হিন্দু সংসারে দেবীর ন্যায় পূজনীয়া এবং আপনার অবস্থায় আপনি পরিতুষ্টা, একথা প্রচার করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের পরিতাপের বিষয়। যদি তিনি বিধবার প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করিয়া, বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের দুঃখিত হইবার কারণ থাকিত না। কিন্তু তিনি তাঁহার দর্শকগণের নিকট যে আলেখ্য ধরিয়াছেন, তাহা জীবনে বড় দুর্লভ। তিনি তাঁহার আদর্শ চিত্র যে বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা ত জগতে কোথায়ও মিলে না। সে পবিত্র ব্রহ্মচারিণী দেবী হিন্দু সংসারে কোথায়? যিনি হিন্দু-সংসারের আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত নহেন, তিনি অক্ষয় বাবুর চিত্র দেখিলে হয়ত মনে করিবেন যে, যে সমাজের গৃহে গৃহে এমন স্নেহময়ী দেবী বিরাজিতা, তাহাতে দুঃখ তাপ আসিতে পারে না। তিনি ভাবিবেন যে, যে সমাজ এই দেবীর পূজা করিতে জানে, তাহাতে পাপ আসিতে পারে না। কিন্তু বড় দুঃখের কথা এই যে, এ চিত্র কেবলই চিত্র মাত্র; জগতে ইহার জীবন্ত প্রতিকৃতি দেখিতে পাই না। অক্ষয় বাবুর বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল যে, তিনি উপন্যাস লিখিতেছেন না। সামাজিক অবস্থা, কল্পনা বিকাশের স্থান নহে। তিনি ত বিধবাকে সর্ব্বজন-পূজ্যা দেবী বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুসমাজে যে তাহাকে কত নির্যাতন, কত লাঞ্ছনা, কত অপমান, সহ্য করিতে হয়, তাহারত একবারও উল্লেখ করেন নাই। সত্য প্রতিপাদনই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য, তবে তিনি এক দিক দেখাইয়াই পরিতুষ্ট আছেন কেন? তিনি কি জানেন না যে, বিধবা হিন্দুসমাজে কতই নিগৃহীতা ও কতই লাঞ্ছিতা হইয়া দিনপাত

করে ? বিবাহ বল, আনন্দ উৎসব বল, দেবসেবার মাঙ্গলিক কার্য্যই বল, সমাজ যে তাহাকে কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না, একথা তিনি বিস্মৃত হইলেন কেন ? সংসারের এক জন হইয়াও যে সে কেহ নয়, রাজরাণী হইয়াও যে সে পথের ভিখারিণী, সকল বিষয়েই যে তাহাকে অন্যের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, একথা তিনি গোপন করিলেন কেন ? অহোরাত্র তাহাকে যে কত মলিন,কত সঙ্কুচিত হইয়া অতিবাহিত করিতে হয়,তাহাত ভুলিবার কথা নয়। তাহার রক্ষক তাহার অলঙ্কার গুলি হরণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন, দেবর তাহাকে বিষয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন,ভ্রাতৃজায়া তাহাকে আপনার পুত্র কন্যার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিবার জন্য অভিলাষ করেন এবং প্রতিবেশীগণ তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, সতীত্ব রত্ন অপহরণ করিবার জন্য উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করেন। অক্ষয় বাবু কি এ সকল কথা জানিতেন না, না ইচ্ছা পূর্ব্বকই গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন ? তিনি কি জানেন না যে, তাঁহার এবং আমার আত্মীয়গণের মধ্যে, কত হতভাগিনী ইন্দ্রিয়-সংযমে অসমর্থা হইয়া,পাপ স্রোতে পৃথিবীকে কলঙ্কিতা করিতেছে ?* কত অভাগিনী আত্মীয় স্বজনের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য, অকালপ্রসব-যন্ত্রনায়, অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়া, হিন্দুসমাজকে ঘোরতর পাপ পঙ্কে নিমগ্ন করিতেছে। নিদাঘের একাদশী রাত্রির শেষে যখন বিধবা বালিকা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করে—"মা আজ কি রাত পোয়াবেনা" তখন সেই শুষ্ক কণ্ঠের ধ্বনি কি তিনি শুনিতে পান না ? যখন সংসারের কোন আনন্দদিনে, মাতা, ভগ্নী, ও ভ্রাতৃজায়াকে অলঙ্কারে সুসজ্জিতা দেখিয়া, সঙ্গিনীগণকে স্বামী-সুখে উৎফুল্ল দেখিয়া অভাগিনী বিধবা নির্জ্জন গৃহে আসিয়া, উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলে—"জগদীশ,কি দোষে আমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছিলে" তখন তাহার সেই অশ্রুপূর্ণ মুখ, নীরবক্রন্দন, তিনি কি দেখিতে পান না ? গর্ভস্থ শিশু যখন মাতৃগর্ভে বিনষ্ট হইয়া, মৃত্যুকণ্ঠে হিন্দুসমাজকে অভিসম্পাত করিয়া বলে, "এই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তবে আমাকে এ জগতে আনিয়াছিলে কেন !" তখন সেই ক্ষুদ্র শিশুর অস্ফুট রোদন,যন্ত্রণাজড়িত কণ্ঠস্বর, তিনি কি শুনিতে পান না ? কিন্তু যাহারা দৃক্ শক্তি থাকিতেও অন্ধ, শ্রুতি শক্তি থাকিতেও বধির, তাহাদিগের নিকট এ সকল কথা বলিবার প্রয়োজন কি ?

বড় ক্ষোভ রহিল যে, আমাদিগকে কেবলই বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধ-যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াই নিরস্ত হইতে হইল। বিধবা বিবাহের অনুকূলে কোন কথা বলি-

---

* বর্ত্তমান সময়ে যে হিন্দু-বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে, তাহা এই জন্য যে, সমাজে কেবল বালিকা বিবাহই প্রচলিত হইয়াছে। বালিকা-বিবাহ উঠিয়া গেলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকা সঙ্গত হইবে কি না, সে স্বতন্ত্র প্রশ্ন। নবজীবন সম্পাদক বা শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, বালিকা বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, সে বিষয়ে আজও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন নাই। (নবজীবন—জ্যৈষ্ঠ, ৭০৯ পৃষ্ঠা।)। এরূপ স্থলে, যে আধ্যাত্মিক বিবাহ সমাজে প্রচলিত নাই, তাহার ধুয়া ধরিয়া, কল্পনাময় ভাষায় বৃথা আড়ম্বর করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের চেষ্টাতে কি কিছু মহত্ত্ব আছে ?

ন: স:।

বারই আমরা অবসর পাইলাম না; যদি সময় দেখি, তবে একবার প্রস্তাবান্তরে সে কথা বলিবার জন্য চেষ্টা করিব। কিন্তু বিধবার জন্য আর কি কোন কথা বলিবার বাকী আছে? সেই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার কথা কি আর লোককে বলিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে? এই হিন্দুসমাজে এমন সৌভাগ্যবান পুরুষ কে আছেন, যাঁহার আত্মীয়াগণের মধ্যে কেহ বাল-বিধবা নাই? এই হিন্দুসমাজে এমন হৃদয়বান পুরুষ কে আছেন, যাঁহাকে কোন না কোন দিন, সেই রুক্ষ-কেশা, মলিন-বেশা, বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া, নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতে না হইয়াছে? কোন্ গৃহ বিধবার দীর্ঘনিশ্বাসে দগ্ধ না হইতেছে? কোন্ গৃহ বিধবার অশ্রুজলে কলঙ্কিত না হইতেছে? তবে আবার বিধবার জন্য কাঁদিতে যাইব কোথায়? কাঁদিবার স্থান জগতে কেবল একটী মাত্র আছে। নিষ্ঠুর সমাজ এ দুঃখ কোন কালে বুঝিতে পারিবে না, সামাজিকগণ এ দুঃখ বুঝিবার চেষ্টা করিবেন না; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ দেবতা, তুমিত সকলই জানিতেছ, তুমিত সকলই বুঝিতেছ, তবে হিন্দু বিধবার, এ যন্ত্রণা কি ঘুচিবে না?

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

মহারাষ্ট্রে মহাকীর্ত্তি।

আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে আপনার অধিকার বিস্তারে উদ্যত হইয়াছেন। মহাবীর শিবজী অপূর্ব্ব বীরত্ব বলে সম্রাটের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার সাহস বাড়িয়া উঠিয়াছে—উচ্চতর অধ্যবসায়, মহত্তর সাধনা বিকাশ পাইয়াছে। তিনি অতুল সাহসে, অসামান্য বিক্রমে, অলৌকিক অধ্যবসায়গুণে স্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্যভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গপ্রবাহ ভৈরব রবে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী দক্ষিণাপথে অটল গিরিবরের ন্যায় দাঁড়াইয়া, লোকাতীত তেজস্বিতার সহিত সেই তরঙ্গপ্রবাহের গতিরোধ করিতেছেন। খ্রীঃসপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত এইরূপ বীরত্ব-কীর্ত্তিতে উজ্জল হইয়াছিল। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে স্বাধীনতার স্বর্গীয় মূর্ত্তি এইরূপ ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্তে প্রকাশ পাইয়া লোকের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। ঘোর দুর্দ্দিনে মেঘমালার একদেশ হইতে সূর্য্যের অনতিস্ফুট আলোক নিঃসৃত হইয়া অন্ধকারময় স্থান এইরূপ উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আওরঙ্গজেব শিবজীর পরাক্রম খর্ব্ব করিতে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মাজেম ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শিবজীর সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ মোগলের হস্তগত হইয়াছে। মোগল পক্ষের অনেক রাজপুত সৈন্য সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতেছে। আজ শিবজী এই দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত—মোগলের সমক্ষে আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প। বীরশ্রেষ্ঠ আজ এই উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন—

নীরবে গম্ভীর ভাবে বিপক্ষের ক্ষমতা নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

সিংহগড় নিসর্গরাজ্যের গভীর সৌন্দর্য্যময় স্থানে অবস্থিত। ইহা উন্নত পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এক দিকে সহ্যাদ্রি অনন্ত গগনে মাথা তুলিয়া আপনার অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। সহ্যাদ্রির পূর্ব্ব প্রান্তে সিংহগড়। উত্তরে ও দক্ষিণে সমুন্নত পর্ব্বত লম্ব ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বত অতিশয় দুরারোহ। অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া সঙ্কীর্ণ দুর্গম গিরিপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। পশ্চিম দিকেও এইরূপ দুর্গম, দুরারোহ পর্ব্বত বিস্তৃত রহিয়াছে। দুর্গটী ত্রিকোণাকার। উহার মধ্য ভাগের পরিধি প্রায় দুই মাইল। ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর দুর্গের বহির্ভাগ রক্ষা করিতেছে। যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, অনভ্র নীল গগনে সূর্য্যালোক প্রকাশ পায়, তখন পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীরা নদীর বৃক্ষলতা পরিশোভিত শ্যামল তটদেশ নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে থাকে। উত্তর দিকে পর্ব্বতের বহিঃপ্রদেশ প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র। শিবজীর বাল্যকালের লীলাভূমি পুনানগরী এই ক্ষেত্রের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে কেবল উন্নত ও অবনত শৈলমালা সুনীল বারিধির তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই অভ্রভেদী গিরির শিখরগুলি সুদূর দিগন্তে—অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। এই দিকে শিবজীর রায়গড় অবস্থিত। শিবজীর সেনাপতি তন্নজী এই দুর্গম দুরারোহ গিরি-দুর্গ অধিকার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাঘমাস। দুর্গম গিরিপ্রদেশে দুরন্ত শীত আপনার দ্বিগুণ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সাহসী তন্নজী এই শীতের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে একহাজার মাওয়ালী সৈন্য লইয়া সিংহগড় অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। গিরিপথগুলি এই সকল সৈন্যের পরিচিত ছিল। ইহারা গভীর নৈশ অন্ধকারে নির্ভয়ে নিঃশব্দে এই পরিচিত গিরিপথ দিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তন্নজী আপনার সৈন্য দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একভাগ কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের উপর আদেশ ছিল যে, ইহারা আদেশ প্রাপ্তি মাত্র অগ্রসর হইবে। অপর ভাগ দুর্গের ঠিক নিম্নে পর্ব্বতের পাদদেশে লুক্কায়িত রহিল। ইহাদের মধ্যে একজন সাহসী বীরপুরুষ নিঃশব্দে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বিশেষ সত্বরতার সহিত একগাছি দড়ির মই ফেলিয়া দিল। শিবজীর মাওয়ালী সৈন্যগণ ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এই সোপান মাত্র অবলম্বন করিয়া একে একে উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে তিন শত সৈন্য উপরে উঠিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটী শব্দ হইল। এই শব্দে দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেরা, যে দিক দিয়া মাওয়ালী সৈন্য উপরে উঠিতেছে, সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। একজন সৈনিক, ঘটনা কি, জানিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইয়াছে, অমনি এক জন মাওয়ালীর নিক্ষিপ্ত তীরে তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। কিন্তু এই শব্দে দুর্গরক্ষীরা অগ্রসর হইতে লাগিল। তন্নজী তখন বিপুল সাহসে তিনশত মাত্র সৈন্য লইয়া সেই বহুসংখ্য দুর্গরক্ষীকে আক্রমণ করিলেন। মাওয়ালীগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়া দুর্গরক্ষী সৈন্য-

দিগের উপর অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তন্নজী প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় সেই যুদ্ধ-স্থলে বীর শয্যায় শায়িত হইলেন। তখন মাওয়ালী সৈন্যগণ রণক্ষেত্র হইতে নীচে নামিবার জন্য দৌড়িতে লাগিল। এমন সময়ে তন্নজীর ভ্রাতা সূর্য্যজী যুদ্ধ স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে মাওয়ালীদিগকে কহিলেন—"কোন্ নরাধম আপনার পিতার দেহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে? দড়ির মই নষ্ট হইয়াছে। সকলে যে, শিবজীর মাওয়ালী সৈন্য, এখন তাহারই প্রমাণ দেওয়া উচিত।"

সূর্য্যজীর এই তেজস্বীতাময় বাক্য মাওয়ালীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা আবার "হর হর মহাদেব" শব্দে শত্রুদলে প্রবিষ্ট হইল। এই গম্ভীর শব্দে গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া পর্ব্বতকন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এবার মাওয়ালীগণ এরূপ বেগে দুর্গ রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিল যে, তাহারা কিছুতেই এই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। পাঁচ শত দুর্গরক্ষী সাহসী সৈনিক-পুরুষ মাওয়ালীদিগের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। সূর্য্যজী বিজয়ী হইলেন। দুরারোহ পর্ব্বত শিখরস্থিত সিংহগড়ে আবার শিবজীর বিজয় পতাকা সুদূর গগনে প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

এই বিজয়-বার্ত্তা শিবজীর নিকট পঁহুছিল। কিন্তু শিবজী যখন শুনিলেন যে, দুর্গ অধিকার করিতে তন্নজী নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি গভীর শোকে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন—"সিংহের আবাস-গৃহ অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সিংহ হত হইল। আমরা দুর্গ হস্তগত করিলাম, কিন্তু হায়! তন্নজীকে জন্মের মত হারাইতে হইল।"

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও দার্শনিক প্রমাণ।

(প্রত্যুত্তর)

"নব্যভারতের" বিগত সংখ্যায় বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের লিখিত উক্ত শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মের দার্শনিক আলোচনা প্রত্যেক চিন্তাশীল এবং ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির নিকট আহ্লাদের বিষয় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাতে মানসিক জড়তা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীনতা দূর হয়, সুতরাং মন নির্ম্মল জ্ঞানালোক লাভের জন্য প্রস্তুত হয়। বিজয় বাবুর প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ দুঃখের বিষয়ও আছে, সন্দেহ নাই; দুঃখের বিষয় এই যে, দর্শনালোচনা দ্বারা সম্প্রতি তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে "বিশ্বাস স্থাপনকারীদিগের আলোক অতি ক্ষীণ, অতি ক্ষুদ্র, আবার স্পেনসার প্রভৃতি কর্ত্তৃক উৎপন্ন অন্ধকার অতি নিবিড় এবং অসীম।" যাহা হউক, আশা করি তাঁহার এইভাব স্থায়ী হইবে না। ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় আর একটু গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলে এই সংস্কার চলিয়া যাইবে। আমরা বিজয় বাবুকে একটী পরামর্শ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না;

তাঁহার লেখার ধরণে বোধ হইল, তিনি একটী বিশেষ শ্রেণীর দার্শনিকদিগের সহিতই সুপরিচিত; ইহাদিগকে মোটামোটি প্রত্যক্ষবাদী বা অজ্ঞেয়তাবাদী বলা যায়; আমাদের পরামর্শ এই যে, তিনি স্পেন্সারও বেন্ প্রমুখ এই দলের নিকট কিছুদিনের জন্য বিদায় লইয়া বার্ক্লি, ফেরিয়ার, ফ্রেজার, গ্রীন, কেয়ার্ড ও মারটিনো প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী দার্শনিকদিগের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হউন; এবং ক্রমে অপেক্ষাকৃত অগভীর ইংলণ্ডীয় দর্শনের ভূমি ছাড়িয়া গভীরতর জার্ম্মান্ দর্শনের রাজ্যে প্রবেশ করুন্।

যাহা হউক, এই সকল কথা আনুষঙ্গিক মাত্র, ইহাতে বিজয় বাবুর প্রদর্শিত যুক্তি সমূহের কিছুই উত্তর দেওয়া হইল না। কিন্তু রীতিমত তাহার উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আরো দুই একটী আনুষঙ্গিক কথা বলিব। বিজয় বাবু তাঁহার প্রবন্ধের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মসমাজেও দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাইতেছি; এক শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া, আত্মজীবনে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্ম-অভিজ্ঞতা তর্কহীন ভাষায় সকলকে শুনাইতেছেন; অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা যুক্তি ও তর্ক বলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীভুক্ত; ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা-প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ও Roots of Faith-প্রণেতা বাবু সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।" বিজয় বাবুর এই শ্রেণী-বিভাগটী আমাদের ভাল লাগিল না। প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা কেবল "তর্কহীন-ভাষায় আত্ম-অভিজ্ঞতা সকলকে শুনাইতেছেন," এবং অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা "সর্ব্বদা যুক্তি তর্কবলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট," এই কথা যে ঠিক নহে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। "যুক্তি ও তর্ক বলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করাতে" যাহা বুঝায়, তাহা বাবু কেশবচন্দ্র সেন জীবনের শেষ ২১ বৎসর ভিন্ন কখনই ছাড়েন নাই। প্রাচীন আদিসমাজের সময় হইতে নব-বিধানের শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত একটী না একটী ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার্থী যুবকদল সর্ব্বদাই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিত; ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় তাঁহার উৎসাহ সর্ব্বদা অব্যাহত ছিল। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্বন্ধেও এই কথা অনেক দূর সত্য। কতিপয় বৎসর এই প্রবন্ধ-লেখক তাঁহারই শিক্ষাধীন একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আলবার্ট হলে কেশব বাবুর ইদানিন্তন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের যে সকল অধিবেশন হইত, তাহাতেও প্রতাপবাবু মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করিতেন। এখন তিনি এই সম্বন্ধে কার্য্যত নীরব থাকিলেও, এই বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ কিছুই কমেই নাই। কিছু দিন হইল তাঁহার নিকট হইতে যে যে একখানা স্নেহলিপি পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে এ স্থলে ২।১টী কথা উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় পাঠকদিগের নিকট তাহা অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রীতিকর বোধ হইবে না। তিনি বলিতেছেনঃ—"My sympathy with the aspirations of pure free theistic thought continues unabated. Where I have foiled to persuade the youth of the Brahmo Somaj to find sure foundations of their trust in the eternal verities of a devout philo-

sophy, may you succeed, and others like you." অপর দিকে দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মেরা যে কেবল "যুক্তি ও তর্কবলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট" নহেন, তাঁহারাও যে "তর্কহীন ভাষায় আত্মঅভিজ্ঞতা সকলকে শুনাইতেছেন," তাহাও বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে কেবল একজন ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-বিষয়ক-বক্তা ও লেখক নহেন, তিনি যে একজন অতি উন্নত ভক্ত প্রচারক, তাঁহার আত্মঅভিজ্ঞতা দ্বারা যে দিন দিন কত লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহা ব্রাহ্মমাত্রই অবগত আছেন। Roots of Faith-প্রণেতার আত্মঅভিজ্ঞতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, সন্দেহ নাই, তবে যখন বিজয় বাবু সজোরে তাঁহাকে আনিয়া উক্ত শ্রদ্ধেয় মহাত্মাদিগের মধ্যে ফেলিয়াছেন, তখন বোধ হয় বলাতে কোন ক্ষতি নাই যে, তাঁহার প্রণীত Gleams of the New Light এবং "সাধন-বিন্দু" নামক পুস্তিকাদ্বয় ধর্ম্ম-পিপাসুদিগের নিকট যাহা কিছু আদর লাভ করিয়াছে, তাহা ঐ "তর্কহীন আত্ম-অভিজ্ঞতার" জন্যই, "যুক্তি তর্কের" জন্য নহে। বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসঙ্গ করিতে হইল, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

অতঃপর মূল বিষয়ের আলোচনা করা যাক। বিজয় বাবুর মীমাংসাটী একটু আশ্চর্য্যজনক। তাঁহার মীমাংসা এই যে, দার্শনিক বিচারে ঈশ্বর নির্ণয় অসম্ভব, অথচ ঈশ্বর আছেন। "দার্শনিক বিচার" কথটার অর্থ সম্বন্ধে বিজয় বাবুর কিছু ভ্রম আছে। জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর যে আছেন, ইহা বিজয় বাবু কেন বিশ্বাস করেন? এই সম্বন্ধে তিনি তাঁহার প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে কিছুই বলেন নাই। ২১১ স্থলে বলিয়াছেন—"নিত্য-প্রত্যক্ষ বিষয়ের যুক্তি দ্বারা প্রমাণ হয় না" ইত্যাদি। এক স্থলে ফরাসী পণ্ডিত জুবার্টের কথায় বলিয়াছেন—"It is not hard to know God provided one will not force oneself to define him.* Do not bring into the domain of reasoning that which belongs to our innermost feelings. "Innermost feelings" কথাটাতে কিছুই বুঝা গেল না; feeling এর দ্বারা বাহিরের অস্তিত্ব জানা যায় না, আপন আপন ভিতরকার অবস্থা মাত্র জানা যায়। জ্ঞানই একমাত্র অস্তিত্বের প্রমাণ। তবে "নিত্যপ্রত্যক্ষ" কথাটা কিছু বুঝায় বটে। বিজয়বাবু কি ঈশ্বরকে নিত্যপ্রত্যক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করেন? নিত্যপ্রত্যক্ষ কি অর্থে? এক নিত্যপ্রত্যক্ষ বাহেন্দ্রিয়ের বিষয়, দ্বিতীয় নিত্যপ্রত্যক্ষ মানসিক অবস্থা নিচয়; "নিত্যপ্রত্যক্ষের" আর একটী কেবল অর্থ থাকে—"আত্মপ্রত্যয় বা সহজ-জ্ঞান সিদ্ধ"। ঈশ্বর বাহেন্দ্রিয় বা অন্তদৃষ্টির (self-consciousness) বিষয় নহেন, সুতরাং তিনি প্রথম দুই অর্থে নিত্যপ্রত্যক্ষ হইতে পারেন না; তবেই তাঁহাকে নিত্য-প্রত্যক্ষ বলিয়া মানিতে গেলে, বলিতে হইবে, তিনি আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ। এখন, ঈশ্বর বিশ্বাস যদি আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ সত্যই হইল, তবে আর ইহা দার্শনিক বিচারের অতীত হইল

* যাহাকে কোন না কোন প্রকারে Define (বর্ণনা বা সংজ্ঞা করা যায় না, তাহাকে ঈশ্বর বলেন কেন? ঈশ্বর কথাটি Definition বাচক। আত্মা, শক্তি, আদিকারণ, যাহাই বল, প্রতি কথাই Definition বুঝাইবে। যাহাকে Define করা যায় না, তাহার অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না।

কি রূপে? আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ সত্য কিছু আছে কি না? যদি থাকে, তবে তাহাদের লক্ষণ কি, তাহাদের সংখ্যা কত, তাহাদের বিষয় কি কি, এই সকল বিষয়ের বিচার দর্শন শাস্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বর বিশ্বাস যদি আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য হয়, তবে তাহা দার্শনিক বিচারের অতীত নহে। কতকগুলি লোকের সংস্কার (ইহারা দর্শনের বিষয় কিছুই জানেন না) যে, দর্শন কেবল যুক্তিতর্ক বলেই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট। বিজয় বাবু অবশ্য এই শ্রেণীর লোক নহেন; আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ বা "নিত্যপ্রত্যক্ষ" সত্য ভিন্ন যে যুক্তিতর্ক দাঁড়াইতে পারে না, এবং দর্শনের মূল সূত্র সমূহ যে "নিত্যপ্রত্যক্ষ, তাহা বিজয়বাবুকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। বিজয় বাবু কি বলিতে চান যে, দর্শনে যাহাকে "আত্মপ্রত্যয়" (intuition) বলা হয়, ঈশ্বর বিশ্বাস তাহারও অতীত? তবে পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি— ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কেন? যুক্তিতর্কের ভূমি ছাড়াইয়া, আত্মপ্রত্যয় সহজজ্ঞানের ভূমি ছাড়াইয়া, আর বিশ্বাসের ভূমি কোথায়? এই সমুদায়ের অতীত যে বিশ্বাস, তাহাকে কুসংস্কার বা কল্পনা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? দর্শনের "বালির ভিত্তি" ভাঙ্গিয়া বিজয়বাবু কি আমাদিগকে সার সত্যপূর্ণ কল্পনার রাজ্যে লইয়া যাইতে চাহেন? তবে আর সত্যলাভ বা সত্য নির্ণয়ের জন্ত জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন কি? যাহার কল্পনাতে যাহা আসে, বিশ্বাস করিলেই হয়। কেহ যদি এই কল্পনারাজ্যে বিশ্বাস লাভ করিয়া থাকেন, করুন; আমার মন বড়ই সন্দেহ-প্রবণ; এরূপ সস্তা বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি বড়ই দরিদ্র।

এখন বিজয় বাবুর মীমাংসার দ্বিতীয় বিভাগে আসা যাক্। আমার ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানাকে 'নব্য ভারতের' পাঠকগণের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়াতে, আমি বিজয়বাবুর নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ আছি। ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত স্থান ইহা নহে, নতুবা এই বিষয়ে আরো বিশেষ রূপে বলিতাম। কিন্তু বিজয় বাবুর প্রবন্ধটী পড়িয়া বোধ হইল, তিনি গ্রন্থ খানা তাদৃশ মনযোগের সহিত পড়েন নাই। তাহা করিলে, তাঁহার অনেক আপত্তির উত্তর গ্রন্থ মধ্যেই পাইতেন। এখন আমাকে সেই সমুদায়ের পুনরুক্তি করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া যে কিছু বলিতে পারিব বা বুঝাইতে পারিব, তাহার আশা নাই, কেননা তাহা অনেক স্থান-সাপেক্ষ। বিজয় বাবু আমার প্রধান যুক্তির সমালোচনা করিয়াছেন, অথচ যুক্তিটী আমার ভাষায় কিম্বা আমার ভাবে কোন স্থানেই উল্লেখ করেন নাই। পাঠক পুস্তক খানা পাঠ না করিলে আমার যুক্তির বল বা দুর্ব্বলতা এবং সমালোচনার যুক্তিযুক্ততা বা যুক্তিহীনতা কিছুই ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন না। যাহা হউক, সংক্ষেপে যত দূর পারি তাঁহার আপত্তি গুলির উত্তর দিতেছি।

প্রথমত, বিজয় বাবু যে বলিয়াছেন, "এই মায়াবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বাবু সীতানাথ দত্ত Roots of Faith নামক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে ঈশ্বর প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন," এই কথাটী সম্পূর্ণরূপ ঠিক নহে। মায়াবাদের উপর না দাঁড়াইলে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন সমূহের চূড়ান্ত বিচার হয় না, ধর্ম্মবিশ্বাস সুদৃঢ় অটল ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত হইতে পারে না, ইহ

উক্ত পুস্তকে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিষয়ের আলোচনা পুস্তকের অতি অল্প স্থান মাত্র অধিকার করিয়াছে। যাঁহারা মায়াবাদ মানেন না, বা বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের বোধগম্য এবং মায়াবাদ-নিরপেক্ষ কারণবাদের যুক্তি এবং অজ্ঞেয়তাবাদের সমালোচনাতেই পুস্তকের অধিকাংশ পরিপূর্ণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমূহ যে প্রকৃত অর্থে বাহ্যবস্তু নহে, আত্মা-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নহে, উহারা যে মানসিক ভাব পরম্পরা মাত্র, এই মতের ব্যাখ্যাতে পুস্তকের কিয়দংশ অধিকৃত, কিন্তু এই মত যে মায়াবাদ নহে, ইহা যে আধুনিক মায়াবাদ ও প্রকৃতিবাদের সাধারণ ভূমি, তাহা বিজয় বাবু অবশ্যই জানেন। অথচ দর্শনানভিজ্ঞ লোকেরা ইহাকেই মায়াবাদ বলে। প্রকৃত মায়াবাদ হচ্চে এই যে, বাহ্যজগৎ নামধেয় এই যে ভাবনিচয়, ইহাদের কোন অচেতন আধার বা কারণ নাই। এই মায়াবাদ Roots of Faith এর মত, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু, যাহা বলা হইল,—পুস্তকের অধিকাংশই মায়াবাদ-নিরপেক্ষ যুক্তিতে পরিপূর্ণ।

অতঃপর বিজয় বাবুর প্রথম আপত্তিতে আসা যাক্। বিজয়বাবু বলিতেছেন—"আমরা দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রভৃতি গুণ* সমষ্টিকে জগৎ বলিয়া অনায়াসে ভাবিতে পারি, এবং স্বীকার করি যে আধার কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু জগতাধার নাই, একথা বলাও কি অসঙ্গত নয়? আধার স্বীকার এবং অস্বীকার উভয়ই কি অতর্কিত কথা নয়? আমাদের মনে হয় যে এস্থলে অজ্ঞেয়তাবাদই সর্ব্বথা প্রশস্ত।" এই কথার উত্তর Roots of Faith এর তৃতীয় প্রবন্ধের শেষভাগে (পৃ ১২-১৩) কতকটা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা হয়ত বিজয় বাবুর আপত্তির পক্ষে যথেষ্ট নহে। বিজয় বাবুর কথার উত্তর এই;—ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয় সমূহ যখন ভাবনিচয়-মাত্র, ইন্দ্রিয়বোধ-পরম্পরা মাত্র, তখন তাহাদের জন্য কিরূপ আধারের প্রয়োজন? ভাবের আধার, বোধের আধার কেবল মনই হইতে পারে। জড়রূপী আধার-কল্পনার কেবল যে প্রয়োজন নাই, তাহা নহে, "মানসিক ব্যাপারের জড়রূপী আধার" এই কথাটা নিতান্তই অসঙ্গত। "গোলাকার ত্রিকোণ," "চতুষ্কোণবৃত্ত," "সোণার পাথরের বাটি" এই সমুদয় যেমন আত্ম-বিরোধী (self-contradictory) ভাব, এবং এরূপ বস্তুর অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, "মানসিক ভাবের জড় আধার" এটাও তেমনি অসঙ্গত, (self-contradictory) এবং অসম্ভব। সুতরাং এসম্বন্ধে অজ্ঞেয়তাবাদ আদবেই তিষ্ঠিতে পারে না। জড়াধার মানিবার প্রয়োজন নাই, কেবল তাহা নহে, জড়াধারের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে বিজয় বাবু আর একটা অতি কাচা কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। "In regard to the object properties all minds are affected alike: in regard to the subject properties, there is no constant agreement." বেন্ সাহেবের এই কথাটা উদ্ধৃত করিয়া বিজয়বাবু বলিয়াছেন,—"তাহা যদি হইল, তবে তো পদার্থের নিজস্ব কিছু থাকিবার সম্ভাবনা

---

* 'গুণ' কথাটা এরূপ স্থলে আপত্তিকর; 'বিষয়' 'ভাব' বা 'ইন্দ্রিয়বোধ' বলা উচিত। "গুণ" বলিলে ইন্দ্রিয়াতীত, ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ 'শক্তি' বুঝাইতে পারে।

আছে।" কি আশ্চর্য্য! ভিন্ন ভিন্ন মনে কতকগুলি ইন্দ্রিয়বোধ একই নিয়মে, একই ভাবে আবির্ভূত হয়, ইহাতে পদার্থের নিজত্ব কি প্রকাশ পাইল? ইহাতে কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের অপরিবর্তনীয়তা এবং নিয়ন্তার অটল ইচ্ছাই প্রকাশ পাইল; ইন্দ্রিয়বোধের ইন্দ্রিয়বোধত্ব, ভাবের ভাবত্ব, বিষয়ের বিষয়ী সাপেক্ষতা কিছুই দূর হইল না। "মানসিক ভাবের জড়াধার" এই অসঙ্গত বিষয়ও সঙ্গত বলিয়া সপ্রমাণ হইল না।

অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,জড়াধার-রূপী এই যে অসঙ্গত বিষয়, ইহাকে বিজয় বাবু,সমুদয় সত্যের আধার স্বরূপ যে আত্মা, তাহার সহিত এক পদবীতে রাখিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঐ যে জ্ঞানের অতীত, কল্পনার অতীত, নিষ্প্রয়োজন, অসম্ভব সোণার-পাথরের বাটিটী, উহা না থাকিলে মন বলিয়াও কোন স্থায়ী বস্তু নাই, অথবা আছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার যুক্তি এই :—"স্মৃতি, আশা, বুদ্ধি সকলই ঘটনা (phenomena*) মাত্র। তবে তর্ক উঠিতে পারে যে, সকল অস্থায়ী ঘটনার মধ্যে যে এক স্থির আমি জ্ঞান আছে, ঐ আমি-জ্ঞান কি? তাহা বুঝাইতেছি; আমি-ভাব (ego-phenomenon) জ্ঞানের বা consciousness এর অবস্থান্তর মাত্র। Secretion কথা ব্যবহার করিলে সহজে এভাব বুঝাইয়া দেওয়া যায়।" এই কি আমি-জ্ঞানের যথার্থ বর্ণনা হইল? আমি-জ্ঞান জ্ঞানের কোন 'অবস্থান্তর" নহে, ইহা সমুদয় জ্ঞানের, সমুদায় মানসিক ক্রিয়ার, সমুদায় ভাবের অবশ্যম্ভাবী আধার, (the very condition and possibility of knowledge and all other states of consciousness.) ইহা না থাকিলে কোন জ্ঞান, কোন মানসিক ক্রিয়াই হইতে পারে না। জ্ঞান বা (consciousnessএর প্রত্যেক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্তমান। ইন্দ্রিয়বোধ, ভাব, বা ঘটনা (phenomenon) মাত্রই একভাবে দেখিতে গেলে দ্বিত্বভাব-ব্যঞ্জক। "দর্শন" বলিলেই আমার দর্শন বুঝায়, "শ্রবণ" বলিলেই আমার শ্রবণ বুঝায়, স্পর্শ বলিলেই আমার স্পর্শ বুঝায়। আমি-ছাড়া দর্শন, আমি-ছাড়া শ্রবণ, আমি-ছাড়া স্পর্শ ইত্যাদি অর্থহীন, অসম্ভব, কল্পনারও অতীত। এই সমস্ত ঘটনাবলীই পরিবর্তনশীল, কিন্তু এই সমুদায়ের অবশ্যম্ভাবী আধাররূপী আমি-জ্ঞান অটল, স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়। আমার ক্ষুদ্র "আমির" ধ্বংশ ভাবিতে পারি, কিন্তু একটী অনন্ত "আমি" না ভাবিলে, কোন বস্তুর কল্পনাই সম্ভবপর নহে। সুতরাং "আমার মনের অস্থায়ীভাব ও আমি একই" এই কথার ন্যায় সার কথা আর কি হইতে পারে? বিজয়বাবু পুনশ্চ বলিতেছেন,—"ঘটনা সমূহ পরে পরে সংঘটিত হইতেছে, প্রত্যক্ষ কথা; এই সংযোগের ফলে জ্ঞান আসিল, স্মৃতি আসিল, আশা আসিল, ইহাও প্রত্যক্ষ কথা; তবে আর অতিরিক্ত একটা আধার লইয়া টানা-টানির প্রয়োজন কোথায়?" তাইতো! বিজয় বাবুর আদর্শ বেন্ প্রভৃতি স্থূলদর্শী দার্শনিকদিগের দৃষ্টি এই পর্য্যন্তই বটে। বলি, এই যে 'পরে পরে সংঘটিত হইতেছে'

* দৃষ্টান্ত ঠিক উপযোগী হয় নাই; এই সমস্ত ঘটনা নহে, ইহারা স্থায়িত্বব্যঞ্জক; যাহা হউক ইহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না।

অসম্ভব, অর্থহীন। ভূত এবং বর্তমা

। কথা কতকগুলি

comparison,
forming

which | might
necessary | both

third; but a
distinctness is pr

their | does

বলিয়া দাবি করিতেছে—কি অসঙ্গত ও অর্থহীন কথা! আশার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতে হইবে না। প্রবহমান বিনাশশীল ভাব পরম্পরা, জ্ঞাতার কর্তৃত্ব ব্যতীত, ভূত এবং বর্ত্তমান সংযুক্ত করিতে যেমন অসমর্থ, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সংযুক্ত করিতেও তেমনি অসমর্থ। পাঠকগণ বোধহয় বিজয়বাবুর যুক্তির সারবত্তা এখন বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন। "ঘটনাসমূহ পরে পরে সংঘটিত হইতেছে" ইহাই কেবল 'প্রত্যক্ষ কথা' নহে; স্থির, অটল, অপরিবর্ত্তনীয় 'আমি' বর্ত্তমান আছি, আমারই সম্বন্ধে, আমার সমক্ষে, ঘটনাসমূহ সংঘটিত হইতেছে, আমারই আশ্রয়ে সংযুক্ত হইতেছে, ইহাও তেমনি 'প্রত্যক্ষকথা'; ইহা কেবল অন্ধ বিশ্বাসের বিষয় নহে, 'টানাটানির' কথা নহে, উজ্জ্বল আত্ম প্রত্যয়, প্রখর অখণ্ডনীয় যুক্তির বিষয়।

বিষয় কেবল স্থায়ী বিষয়ীর আশ্রয়েই—আত্মার ভাবরূপেই, থাকিতে পারে, এই মত, এবং আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস যে বাহ্যজগৎ মানবাত্মার জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া, মানবাত্মার অনাশ্রিত হইয়া, বর্ত্তমান আছে, এই দুই মতের উপর পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের Ontological Argument নামক ব্রহ্মপ্রতিপাদক যুক্তি সংস্থাপিত। এই যুক্তির বিষয় বিজয় বাবু তাঁহার প্রবন্ধে কিছুই বলেন নাই। Roots of Faith এর তৃতীয় প্রবন্ধে পাঠক এই যুক্তির ব্যাখ্যা দেখিতে পাইবেন। এস্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইতেছে:—

"We believe the world to have a permanent existence quite independent of our perception of it. This is the popular belief, and true Philosophy, as we apprehend it, has nothing to say against it. But what can this permanent existence of phenomena mean, and what does it imply ?......Phenomena or appearances can exist, as we have showed, only as appearing to a person; things visible, tangible, perceivable in short, can exist only as perceived by,—as objects of perception to some percipeint being or other, the contrary supposition involving a manifest contradiction. If so, it is clear what is implied in the existence of phenomena independently of ourperception. If the phenomenal world exists, as we believe it does, independently of its perception by finite beings, it exists as the permanent object of an all-knowing intelligence. Matter, phenomenal matter—exists, and can exist only for and in relation to mind. The world,—the phenomenal world......exists and can exist permanently only for and in relation to God. It is he, who is the eternal substance, support and ultimate Reality of all." (P. 11.)

"Roots of Faith" এবং 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়' ব্যাখ্যাত কারণবাদের যুক্তির উপর বিজয় বাবুর প্রথম আপত্তি এই:—'আমি ইচ্ছা করিয়া উৎপন্ন করিতেছি না, অথচ কিরূপে ভাবের উৎপত্তি হইতেছে' এই অন্ধকারকে আলোকিত করিতে গিয়া 'কেহ করিতেছে' এইটী মানিয়া লওয়া হইল; ইহাতে অন্ধকার কমিল না বাড়িল ?" Roots of Faith এ এই আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে, বিজয়বাবু লিখিবার সময় তাহা ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। "কেহ করিতেছে" ইটী মিছামিছি কেবল মানিয়া লওয়া হয় নাই; ঘটনামাত্রেই কোন কর্ত্তৃত্বশালী কারণ (efficient cause) বা অন্য কথায় 'শক্তি' দ্বারা সংঘটিত হয়, ইটী কেবল মানিয়া লওয়া হয় নাই, ইটী যে একটী স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস, ইহাতে যে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের অভ্রান্ত লক্ষণ (বিপরী-

ক্ষের আত্ম-বিরোধিতা—Contradictoriness of the opposite) প্রত্যক্ষভাবে বর্ত্তমান আছে, ইহা অস্বীকার করিলে যে জগৎ একেবারে অন্ধকার হইয়া যায়, তাহা Roots of Faith এ সবিস্তারে দেখান হইয়াছে, একটী স্থল মাত্র উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"It is not simply because we have never seen (perceived) changes to occur except through the action of an agent that we believe there must be an agent behind every action, but there is a higher ground on which the belief rests. It is not merely subjectively necessary, but objectively necessary, —necessary from the nature of things themselves, the contrary proposition actually involving a contradiction... *Phenomena, by their very nature, are dependent, passive, inert, inactive. To say therefore that they can change, can act, of themselves* (can appear disappear or be transformed)—*is to say that inactive things can act—a manifest contradiction.* Wherever therefore, there is change, there must necessarily be an agent behind it as its cause." (p. 18–19.) পাঠক দেখিতেছেন, কর্ত্তা বা শক্তির অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হয় নাই, অপরিহার্য্য সত্য বলিয়া দেখান হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিজয় বাবু আর একটা কথা বলিয়াছেনঃ—"যদি কে করিল, কে করিল বলিয়া চিৎকার করা দার্শনিক যুক্তি, তবে কর্ত্তাকে কে করিল বলিয়া চিৎকার করা তো অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইতেছে।" বিজয় বাবু কারণবাদের যুক্তি আদতেই বুঝেন নাই, বুঝিলে এরূপ আপত্তি তুলিতেন না। আর Roots of Faith এর "Cause—physical and spiritual" শীর্ষক প্রবন্ধ চতুষ্টয় বোধ হয় একেবারেই পড়েন নাই, যদি পড়িতেন, তবে তাহাতে এই আপত্তির যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, অন্তত তার উল্লেখও করিতেন। উক্ত প্রবন্ধ চতুষ্টয়ে দেখান হইয়াছে যে, আমাদের জ্ঞান কেবল ঘটনা বা phenomenaরই কারণ চায়, পরিবর্ত্তনশীল কারণেরই আবার কারণ চায়, যাহা স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয়, তাহার কারণ চায় না, কারণবাদ সে স্থলে খাটেই না। একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"Now, what class of things requires a cause an explanation? Let us see. Our causal inquiry takes the form of a question something like this—how or by whom or what, or under what circumstances did this *come about*, or such and such a thing *come to be* so and so? From this it is evident that it is only the changeful, the ephemeral, the transient that require a cause; it is only things or facts that *come to be*, that begun to exist, which require to be explained. The unchangeable, the eternal, the permanent, if there be such things in Nature, or in relation to Nature, are absolved from such a necessity; they need no cause, no explanation. The causal principle is then not that every *thing* must have a cause but that every *change* must have a cause? (p. 21 22.) অতঃপর, যেমন এক দিকে কেবল পরিবর্ত্তনশীল অস্থায়ী ঘটনা বা বস্তুরই কারণের প্রয়োজন, তেমনি, অপর দিকে,—কারণ, শেষ এবং আদিকারণ কেবল তাহাই হইতে পারে যাহা স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয়, অন্যকারণ-নিরপেক্ষ। "Nothing is a true cause, nothing is truly a cause that requires another cause: that does not entirely satisfy and silence us. An explanation that requires to be explained is an explanation only by courtesy or conversation. সুতরাং কারণবাদের মূল সূত্র একবার মানিতে গেলে একটা স্থায়ী,

নিত্য, অন্যকারণ-নিরপেক্ষ আদি কারণে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই আদিকারণ একজন অনন্ত আত্মা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। প্রকৃত কারণত্ব, কর্তৃত্ব, শক্তি কেবল জ্ঞান বস্তুতেই থাকিতে পারে, ইহা বুঝাইবার জন্য Roots of Faith এবং "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসায়" অনেক বলা হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। মানুষের ক্ষুদ্র আত্মা যে আদিকারণ হইতে পারে না, তাহাও সুস্পষ্ট; ইহা কারণত্বশালী হইয়াও অনিত্য, সৃষ্ট, অন্য কারণসাপেক্ষ; আরো,

"Our finite spirit,since they are finite, afford no explanation of Nature. The world of change and action extends far beyond our small spheres of activity; there is, therefore, an all-knowing, all-powerful spirit within whose knowlodge every thing in Nature is comprehended and to whom all change and action in Nature is due. (P. 37.)......When such a first cause is reached, our causal inquiring finds its fullest satisfaction and is silenced; for an eternal all-knowing all-powerful, benevolent Mind contains in it the promise and potency of all things, present, past and future, and consequently explains everything that has been, is and will be, while in itself it needs no explanation whatever." (P. 40.) সুতরাং "কর্ত্তাকে কে করিল বলিয়া চিৎকার করা অধিকতর দার্শনিক যুক্তি' হওয়া দূরে থাকুক, এই চিৎকারের কোন অর্থই নাই; 'কর্ত্তার' অর্থ, 'আত্মার' অর্থ, "পরমাত্মার" অর্থ যিনি বুঝেন, তিনি এরূপ চিৎকার করেন না।

বিজয় বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি এই— "কার্য্যের সহিত ইচ্ছার যে সর্ব্বত্রই যোগ আছে, কে বলিল? 'আমাতে' এমন অনেক কার্য্য ত সংঘটিত হইতেছে, যে সম্বন্ধে আমার ইচ্ছার সহিত কোন যোগ নাই। অনিচ্ছায় শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, অনিচ্ছায় রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে, অনিচ্ছায় পরিপাক ক্রিয়া সাধিত হইতেছে" ইত্যাদি। আশ্চর্য্য! এই কথা কি আমি, বা 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রণেতা কখনো অস্বীকার করিয়াছেন? অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমাতে আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ (involuntary) এই সকল কার্য্য দেখিয়াই তো স্থির করিতেছি যে, এই সমুদায়ের কারণ আর একটী ইচ্ছা আছে,—আর একটী আত্মা আছে, যাঁহার আশ্রয়ে, যাঁহার করতলে আমি রহিয়াছি। আমাতে যাহা কিছু আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে হইতেছে, তাহাই সেই আশ্রয়রূপী আত্মার কার্য্য। আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ঘটনার সহিত আমার ইচ্ছার যোগ নাই বিজয় বাবু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন, কিন্তু অন্য একটী অদৃশ্য ইচ্ছার সহিত যে সে সমুদায়ের যোগ নাই তাহা তাঁহাকে কে বলিল? যদি বলেন সে ইচ্ছার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? প্রমাণ আত্মপ্রত্যয়। ইচ্ছা ব্যতিরেকে, ইচ্ছা বিশিষ্ট মন ব্যতিরেকে, কর্তৃত্বশালী কারণ বা শক্তি ব্যতিরেকে কোন কার্য্য হইতে পারে না, ইহা যে একটী অপরিহার্য্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য, তাহা দেখাইবার জন্য Roots of Faith এ অনেক বলা হইয়াছে, এই প্রবন্ধেও কিঞ্চিদগ্রে কিছু বলা হইয়াছে, আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। বিজয় বাবু যাহাকে 'বালির ভিত্তি' বলিয়াছেন, সেই 'বালির ভিত্তির' উপর যে কেবল ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা নহে, তাহার উপর আমরা প্রত্যেকেই নিজ-আত্মা ব্যতীত অন্য আত্মার

অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বাস স্থাপন করি; (See Roots of Faith Pp. 19—20) এই 'বালির ভিত্তির' উপর দাঁড়াইয়াই বিজয় বাবু তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বিশ্বাস করিতেছেন যে, তিনি ছাড়া আরো শত শত লোক আছে, যাহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিবে।

বিজয় বাবুর আরএকটী কথার সংক্ষেপে উত্তর দিই। 'অহেতুকি (without motive) ইচ্ছা' মনুষ্য কিম্বা ঈশ্বর কোন জীবে আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরবাদের কিছুই আসে যায় না; 'নির্ব্বিকার' অর্থ যদি এরূপ অসম্ভব-ইচ্ছা-বিশিষ্ট হয়, তবে ঈশ্বর নির্ব্বিকার নহেন। এবং এরূপ নির্ব্বিকার ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর নহেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর ইচ্ছাময়। তাঁহার ইচ্ছা অহেতুকি নহে; তাঁহার ইচ্ছার হেতু আছে, কিন্তু সেই হেতু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে; তাঁহার ইচ্ছার হেতু অনন্তপ্রেম, এই অনন্তপ্রেম তাঁহার প্রকৃতির অঙ্গীভূত; ঈশ্বর অনন্তপ্রেমময় বলিয়াই ইচ্ছাময় এবং কার্য্যশীল, কোন বাহ্যিক কারণের প্রভাবে কার্য্যশীল নহেন। অতঃপর বিজয় বাবুকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক Roots of Faith এ 'Will' কথাটা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—

"The mind as active, as capable of producing changes is called the will. Let the reader understand and stick to this definition of will. Let him not confound will, as philosophically understood with mere desire, mere intention or volition. The will is not an action or a change but a power that produces action and change. It is the mind considered as acting and capable of acting, just as Intelligence is the mind as knowing" (P. 14.

সুতরাং will এর কর্ত্তা বা কর্ত্তৃত্ব। দুর্ব্বলাবস্থায় কর্ত্তৃত্ব জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যম-জ্ঞান (sense of effort) থাকিতে পারে, এবং 'এক সময় (সবলাবস্থায়) এই উদ্যম তিরোহিত হইবে, তাহাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ইহা সপ্রমাণ হইল কৈ যে তখন 'শক্তিজ্ঞান একেবারে থাকিবে না?' এ ইচ্ছা করিতেছি এবং কার্য্য হইতেছে; কিন্তু তাহাতে উদ্যম নাই, আমাদের এরূপ অভিজ্ঞতা আছে, থাকিতে পারে; কিন্তু 'ইচ্ছা করিতেছি' ইহাতেই কর্ত্তৃত্বজ্ঞান বা শক্তিজ্ঞান রহিয়াছে। সুতরাং উদ্যম তিরোহিত হইলেও শক্তিজ্ঞান তিরোহিত হয় না।

প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িল; বিজয় বাবু আরো কত কথা বলিয়াছেন, যাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু এই প্রবন্ধে আর তাহা হইয়া উঠে না। বিজয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এত কথার অবতরণা না করিলেই কি নয়? "দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে ঈশ্বর নির্ণয় কত দূর সম্ভবপর?"—এরূপ গুরুতর প্রশ্ন কি এমন ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মীমাংসা করা যাইতে পারে, না মীমাংসা করিতে চেষ্টা করাই উচিত? যাহা হউক, তিনি আর যাহা যাহা বলিয়াছেন, বিশেষত কোশ-লের যুক্তি সম্বন্ধে যে সমুদায় আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের উত্তর দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইলেও আমি আর পারিলাম না। আশা করি 'ধর্ম্ম-

জিজ্ঞাসা প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যাঁহার পুস্তকে কৌশলের যুক্তি Roots of Faith অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তিনি এই কার্য্যটী সম্পাদন করিবেন।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

সংস্কারকদিগের প্রতি।

"দশের লাঠী একের বোঝা"। এই সমাজ সংস্করণের ভার দশজনে ভাগ করিয়া লইলে সহজ হয়। এমন একজন কুম্ভকর্ণ, কি একদল বীরপুরুষ কে আছে, যে একাকী এই বোঝা বহন করিতে পারে? যখনই একের স্কন্ধে এই মহাভার চাপিয়াছে, তখনই হয় বাহকের পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়াছে, না হয় ভাল করিয়া কার্য্যোদ্ধার হয় নাই। একদিন বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সমাজ-সংস্করণের একটী অসাধারণ নৈতির লক্ষণ বলিয়া গণিত হইত; আজ তাহা, অন্ততঃ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে, অতি সাধারণ কার্য্য বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় একজন পরাক্রান্ত পুরুষ এই বিধবা বিবাহ বিষয়ের সমস্ত ভার নিজ হস্তে লইয়া লোকের কাছে কত নাকাল হইলেন, এবং এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও অবলম্বিত বিষয়ের তাদৃশ উন্নতি সাধন করিতে পারিলেন না। আজ কিনা জন কতক অব্যবসায়ী সৌখীন ব্রহ্মচর্য্যার পাণ্ডা, হিন্দুয়ানীর হুজুগ তুলিয়া গদাহস্তে পথ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলে যে, শৈশবে বৈধব্য ঘটিলে পুনর্ব্বিবাহ দেওয়া নীতি ও ধর্ম্ম উভয়েরই বিরুদ্ধ। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যদি সমুদায় শিক্ষিত দল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মীমাংসাতে যোগ দিয়া, আপনাদের সাধ্য অনুসারে এই পুনর্ব্বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিতেন, আজ আর তাহা হইলে এই অবিদ্যার সাগরে তরঙ্গ উঠিত না। কিন্তু তখন তাঁহাকে লোকে একাকী ফেলিয়া রাখিল, এখন সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইতেছে। তেমনি আবার বর্ত্তমান সময়ে যে সকল উচ্চসংস্করণের প্রারম্ভ দেখা যায়, তাহা পরস্পরের যোগ ও সহানুভূতি অভাবে বিলোপ হইবার সম্ভাবনা। যখন ব্রাহ্মসমাজ মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হইলেন, তখন প্রায় দেশীয় সমস্ত শিক্ষিত দল সেই প্রতিবাদে সায় দেন; কিন্তু সময়ে প্রতিবাদীদের উদ্যম কমিয়া গেল, এবং তদ্দর্শনে আজ, দানব-গ্রস্ত শবের ন্যায়, পুনর্জ্জীবিত পৌত্তলিকতা নব্যভারতের প্রতি মুখভঙ্গী করিতেছে। পরস্পরের সহযোগীতা ভিন্ন ব্রাহ্মগণ কি এই বিকট বীভৎস রহিত করিতে পারেন? কুসংস্কার শতবার হত হইলেও তাহার পুনরুত্থান আছে, এবং সত্যের ন্যায় মিথ্যার বীজ ভূতলে পড়িলে বর্ষার তৃণ তুল্য চারিদিকে সতেজ হইয়া উঠে; যদি তাহা নিবারণ করিতে হয়, ভূমিকর্ষণ করিয়া সত্যের বীজ বপন কর। একার্য্যের জন্য যত কৃষক আবশ্যক, তাহা কোন্ দলে পাওয়া যায়? সকল দল এক না হইলে আর এব্যাপার সম্পন্ন হইবার নহে। যখন সমুদয় হরিসভার অধিবেশন ও সাম্বৎসরিক কার্য্যেতে ব্রাহ্ম সভার মাছি-মারা নকল প্রত্যক্ষ করাযায়, যখন দেখা যায় সত্যব্রত হিন্দুযুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম ভক্ষণ করিয়া

আর্য্যধর্ম্ম রক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, যখন উক্ত সমাজের "সমগ্র উন্নতির" পুরাতন পরিচিত মত, বঙ্কিম বাবুর বিপুল মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া ফিল্টার হইয়া, শ্রীনন্দের-নন্দন সাক্ষাৎ ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি কৃষ্ণের পাদপদ্মে অঞ্জলি দেওয়া হইল, তখন সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সমবেত চেষ্টাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিজ সম্পত্তি রক্ষার সময় হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সপ্তসাগর পার হইয়া কর্ণেল অলকট সাহেব, সাইকিক ও মেসমেরিক শক্তিযোগে পুনরায় কার্ত্তিক গণেশ ও লক্ষ্মী সরস্বতীর ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ করিলেন, ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে নবীন থিয়জবির অনুরাগ আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া কিরূপে আপনাদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ দেখিবেন, ও দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন?

সম্বাদপত্র ও সাময়িক সাহিত্যের এক ঘোরতর অতি-বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এক দেশানুরাগ ও দেশাচারের নামে গ্লানি অসূয়া, অত্যুক্তি অশ্লীলতা মুষলের ধারে চারিদিক হইতে পড়িতেছে, নিবারণ করে কে? একজনের কি একদলের সাধ্যাতীত। সকলেই বলেন, অমুক কাগজ ভারি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, অমুকের উপর অযথা আক্রমণ করা হইয়াছে, অমুক বিষয়ের আলোচনা বড় অন্যায় ভাবে করা হইতেছে; কিন্তু কাহাকেও প্রতীকারের চেষ্টা করিতে দেখা যায় না। এ সমস্ত অত্যাচার রহিত করিতে হইলে, ন্যায় সত্যের পক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রকেই বদ্ধ-পরিকর হইতে হয়, সকল দলকেই একদল হইতে হয়। সদ্ভাবের, ন্যায়পরতার, সুরুচির, ধর্ম্মানুরাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, প্রেমের জোরে অপ্রেমকে নিবারণ করিতে হয়। অতএব আমাদের অনুরোধ, কতকগুলি লোক অগ্রসর হইয়া এই মহৎ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থল হউন।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

মিলন।

১

কোথায় থাকিত দারুণ সংসার,
কি হত জানিনা জীবনের গতি,
কোন্ কেন্দ্র বেড়ি ফিরিত উদ্যম,
নাহি পাইতাম তোমারে যদি।

২

ভাবিতাম তোরে অমূল্য রতন,
তোমা বিনা হ'ত বিফল জীবন,
তুফানে-তাড়িত তরণি মতন,
আশার বাঁধন ছিড়িয়া যেত।

৩

হৃদয়ের বেগ ছিল না তখন,
কে জানে হৃদয় অপূর্ণ এমন,
ভাঙ্গা থাকে মন—হু হু করে প্রাণ,
মনমত মনে না মিলালে মন।

৪

যৌবন গরবে বলেছি তখন,
বৃথা পরিণয় পথের কণ্টক,
শুধু বিড়ম্বনা কেবল যাতনা,
উদ্দেশ্য সাধনে প্রধান আটক।

৫

সে ভ্রম গিয়াছে—বুঝেছি এখন,
তুমিই আমার প্রধান বন্ধন,
দুখ-দগ্ধ মনে অমিয়া মতন,
দারুণ মরুতে ওসিস্ যেমন।

৬

নদী ধায় বেগে সাগর উদ্দেশে,
মেঘ ছুটে যায় শৈলরাজ পাশে,
মিলন মন্ত্রেতে মোহিত জগত,
পরমাণু পরমাণুতে মিশে।

৭

আকাশ নামিয়া মিলে ধরাসনে,
তাড়িত নামিয়া তাড়িতে মিশে,
যদি পায় মন—মনমত মন
চিনিবে—মিলিবে তাহার সনে।

৮

ঐ দেখ চাঁদ আকাশে থাকিয়া
প্রসারি সহস্র কিরণ কর—
আলিঙ্গে সাগরে সুখে গদগদ,
উঠিছে উথলি অন্তর তার।

৯

তবে—
কেমনে থাকিব তোমায় ছাড়িয়া,
পেয়েছি মনের মতন মন,
দেশ কাল বাধা করিয়া লঙ্ঘন,
মিলাব—মিশিব সহ এখন।

১০

রাসায়ন-মিলে মিলিব দুজনে,
কখন হবেনা বিশ্লেষ তার,
জীবনের পথ করিয়া চিহ্নিত,
যাইব দুজনে সংসার পার।

১১

অনায়াসে করি কর্ত্তব্য সাধন,
যতনে করিব ব্রত উদ্‌যাপন,
ভাঙ্গিবে না কভু উদ্যম যতন,
মিলাইলে মনে তোমার মন।

১২

কে বলে রমণী পথের কণ্টক,
উদ্দেশ্য সাধনে প্রধান আটক,
ভ্রান্ত মূঢ়মতি সেজন নিশ্চয়,
জানেনা সেজন রমণী হৃদয়।

১৩

কতই মধুর কতই গভীর,
কত যে আমোদ কোমলতা ভরা,
উৎসাহ মাখান—মধুর মুরতি,
মানব জীবনে পীযুষ খনি।

১৪

এমন অতুল রমণী হৃদয়ে,
হৃদয় আমার দিয়াছি মিশায়ে,
দিবাকরে ধরা বাঁধন যেমন,
কাহার (ও) হবেনা বিপথে গতি।

১৫

ঐ যে তরণী—আমোদে মাতিয়া,
ভাগিরথী বক্ষে ভাসিয়া যায়।
নাচিয়া নাচিয়া তপনে ধরিয়া,
শত ভাগে যেন ভাঙ্গিয়া দেয়।

১৬

উহারই মতন সংসার সাগরে,
ভাসিয়া ভাসিয়া হইব পার,
পরে দেহ ভার, করিয়া অন্তর,
যাইব দুজনে গগনোপর।

১৭

দুজনে মিলিব, এক আত্মা হব,
অনন্ত পুণ্যের সুখেতে ভাসিব,
অথবা বিশ্বেতে স্বাধীন হইয়া,
বাষ্পের মতন ব্যাপিয়া রব।

১৮

যুগ্ম তারা হয়ে থাকিব দুজনে,
দেখাব ধরার মানবগণে—
প্রেমের বাঁধন—কঠিন কেমন—
কখনও হয় না বিলোপ তার।

১৯

কভু কুন তারা গগনে দুজনে মিলিয়ে—
ক্ষীণজ্যোতি তার প্রখর ফুটায়ে—

বিপন্ন নাবিকে দেখাইব পথ,
সংসার-সাগরে দিশাহারা যবে ;
ঘুচাব তুফান পবনে থামায়ে,
উদ্দেশ্যে পথে সে চলিয়া যাবে।

২০

ধরাতে দেখিলে পাপ আচরণ,
মুদিয়া নয়ন—সাধি দিবাকরে
লইব সিন্ধুর বাষ্প উপহার,
সাজাব তাহাতে ঘন আবরণ
ঢাকিব ধরায়—দেখিব না তায় ;
কাঁদাব জলদে পাপীর তরে।

২১

দেখিলে পুণ্যের তাপিত অন্তর ;
পশিব তখনি হৃদয়ে তার,
দুজনে মিলিয়া, শান্তি সুধা দিয়া,
দিবাকর-কর জলদে ফেলিয়া,
আঁকি ইন্দ্রধনু দেখাব তাহায়,
গৌরব-সোপান স্বরগ দ্বার।

২২

দেখিব যখন জগতের গায়ে
পাপীর তাপেতে প্রলয়ের ছায়া—
অন্তরীক্ষে আসি পুণ্যের প্রবাহ
ছুটাব, ঘুচাব এ পাপের মায়া—
জগত হাসিবে, দুর্দিন ঘুচিবে,
উন্নতির পথে চলিয়া যাবে।

২৩

অথবা জীবন সাগরে মিশিয়ে,
পার্থক্য ঘুচায়ে—সব একহয়ে,
সৃজিয়া জীবেরে পুন আত্মা লয়ে,
আবার জীবন-সাগরে মিলাব।

২৪

পরমেশ পাশে পরমাণু সনে,
মিশিয়া প্রাকৃত শকতি সহ—
সৃজন প্রলয় কৌতুকে খেলিয়া,
শূন্য হতে শূন্যে ভাসিয়া যাব।

২৫

যদি কভু বিধি দুজনে লইয়া,
আবার ধরায় জনম দেন,
দুজনে মিলিয়ে—অন্তর মিশায়ে,
জীবনের ব্রত যতনে সাধিয়া।
আবার যাইব গগনপর।

২৬

তবে এস প্রিয়ে হৃদয় বাঁধিয়ে,
মিলিয়ে দুজনে—স্বকার্য্য সাধনে,
সঁপি এ জীবন ব্রত উদ্যাপনে,
সাধি নিজ কাজ করি প্রাণপণ।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

প্রেম-খনি বা প্রকৃত ধর্ম্ম।

"We are the miracle of miracles,—the great inscrutable mystery of God. We cannot understand it, we know not how to speak of it; but we may feel and know, if we like, that it is verily so."—*Thomas Carlyle.*

সচরাচর সকল বস্তুরই দুটী দিক দেখিতে পাওয়া যায়,—এক বাহির, আর এক ভিতর। ভিতর আর বাহিরে ঘনীভূত যোগ থাকিলেও উভয়ের প্রকৃতি, উভয়ের রূপ ও গুণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মনুষ্যের বাহিরের আকৃতি ভিতরের ছায়ায় চিত্রিত হইলেও, ভিতর ও বাহির সম্পূর্ণ পৃথক। বাহিরের অন্তরালে আর এক সূক্ষ্ম রাজ্য সর্ব্বত্র বিরাজিত। তোমাকে প্রথম যখন দেখিলাম, তখন কেবল তোমার রূপ দেখিলাম, আকৃতি দেখিলাম, সৌন্দর্য্য দেখিলাম। ক্রমে দুচারি বৎসর যখন চলিয়া গেল, তখন তোমাকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপ দেখিলাম। যতই তোমাতে ডুবিতে লাগিলাম, ততই যেন ভিতর হইতে তুমি নব নব শোভায় ফুটিতে লাগিলে,—তোমার

কতই শক্তি, কতই গুন, কতই দয়া, কতই জ্ঞান প্রকাশ পাইল; অথবা তুমি যদি অসৎ লোক হও, তবে সময়ে তোমার কতই নির্দয়তা, অপ্রেম, কুজ্ঞান—কাম ক্রোধ হিংসা দ্বেষ প্রকাশ পাইল। কিছু দিন পরে বুঝিলাম, তোমাকে প্রথম যাহা দেখিয়াছিলাম, তুমি প্রকৃত পক্ষে তাহা নহ;—বুঝিলাম, তোমার বাহিরই সর্ব্বস্ব নহে,—ভিতর আছে। এই প্রকারে জীবজগৎ হইতে জড়জগৎ, জড়জগৎ হইতে পুন জীবজগৎ, সর্ব্বত্রই বাহির ও ভিতর এই দুইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল কুসুমের সুগন্ধময়, সৌন্দর্য্যময়, প্রফুল্লতাময় বহিরাবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে যাও, দেখিবে, সেখানে ফুল-পত্রের ন্যায় গন্ধও নাই, সৌন্দর্য্যও নাই, সেখানে বীজকোষে সূক্ষ্ম বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে;—অসারের ভিতরে সার জন্মিতেছে। এক খণ্ড প্রস্তরকে দেখ, তাহার বর্ণ আছে, বিস্তৃতি আছে, পরিধি আছে,—দৈর্ঘ্য আছে,—কত কি আছে। প্রস্তরকে ভেদ কর, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেল, দেখিবে, পূর্ব্বের সকল মিলাইয়া যাইতেছে; ক্রমে আরো চূর্ণ কর, দেখিবে, আরো মিলাইয়া যাইতেছে; শেষে দেখিতে পাইবে, প্রস্তরখ যেন আর নাই—সকল মিলাইয়া গিয়াছে, কেবল কি যেন এক অব্যক্ত, অদৃশ্য, অননুভবনীয় শক্তি রহিয়াছে! এই জন্য, আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, পদার্থের দুই রূপ,—সূক্ষ্ম ও স্থূল। নদী-তীরের বালুকণা যে হিমাদ্রির রূপান্তরিত অবস্থা, কেহ কি তাহা বুঝিতে পারে? ক্ষুদ্র বটবীজের পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড বটবৃক্ষকে দেখিয়া উহারই পরিণতি বলিয়া কি কেহ তাহাকে মনে ভাবিতে পারে? শারীরিক বলের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া কে তাহার ভিতরের অলক্ষিত মানসিক বলের অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে চায়? প্রকাণ্ড, গগনভেদী হিমালয়কে ভেদ করিয়া ভিতরে যাও, দেখিবে, সেখানে শক্তি মিলিয়া পরমাণু হইতেছে, পরমাণু মিলিয়া বালুকণা হইতেছে, বালুকণা মিলিয়া মিলিয়া প্রকাণ্ড পর্ব্বত হইতেছে! কত সূক্ষ্ম বস্তু কত বড় হইয়াছে! অথবা বাহিরের রূপ ও ভিতরের শক্তিতে কত প্রভেদ!

ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে প্রবেশ কর, দেখিবে উহারই ভিতরে কত বড় বৃক্ষের অঙ্কুর; আবার বটবৃক্ষের দিকে তাকাও, দেখিবে উহারই ভিতরে কত অনন্ত বীজ পরিপুষ্ট হইতেছে। একটী ক্ষুদ্র বটবীজে কত অনন্ত বৃক্ষের অঙ্কুর রহিয়াছে, একবার দেখ। সসীম বাহির বড় হইয়াও, কত ক্ষুদ্র; আর অসীম ভিতরে কি অনন্তত্বই প্রচারিত হইতেছে! এক হইতে সংখ্যাতীত বস্তু উৎপন্ন হইতেছে। মানুষকে ভাঙ্গ; দেখিবে, সেখানেও কত সূক্ষ্ম কত বহুত্বে পরিণত হইতেছে। এক হইতে কোটী হইতেছে;—একের ভিতরে কোটী কোটী জীবের অঙ্কুর রহিয়াছে। শরীরের বলকে ভিন্ন ভিন্ন কর,—দেখিবে ভিতরের বল ভিন্ন শরীরে বল নাই,—মৃতের শরীর দুর্ব্বল। শরীর সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু ভিতরে যে বল, তাহার পরিমাণ নাই;—সে অনন্তেরই ছায়া। পণ্ডিতেরা যাহাকে স্থূল শরীর বলেন, তাহারই ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনন্ত শরীর লুক্কায়িত। সামান্য সামান্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া যখন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের দিকে ক্ষণকাল দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তখন এই স্থূল অবয়বের ভিতরে যে

অনন্তস্বরূপত্ব বিরাজিত—তাঁহার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে স্তম্ভিত হই, বিস্ময়ে ডুবিয়া যাই। সূক্ষ্ম যাহা, তাহাই তখন মহান বলিয়া বোধ হয়,—সামান্য যাহা, তাহাই অসামান্য বোধ হয়,—উপেক্ষিত যাহা, তাহাই বলিয়া বোধ হয়;—উপেক্ষিত যাহা, তাহাই সার বলিয়া মনে হয়। সূক্ষ্মত্বেই অনন্তত্ব যেন লাগিয়া রহিয়াছে! চক্ষুর সীমা অতিক্রম করিলেই—অনন্ত শক্তির লীলা স্পষ্ট অনুভব হইতে থাকে।

কি ছাই লিখিতেছি? বাহির ও ভিতরের কথা বলিতেছি কেন?—বর্ত্তমান শতাব্দীতে প্রত্যক্ষ বা জড়বাদ বাহির ভিন্ন আর ভিতর মানিতে চায় না;—যাহা দেখা যায়, অনুভব করা যায়, স্পর্শ করা যায়, তাহা ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চায় না। এই পরিদৃশ্যমান শরীরের ভিতরে জড়ভিন্ন আর যে কিছু শক্তি আছে, জড়বাদী তাহা মানেন না, জগতের ভিতরে আর কোন শক্তি আছে, তাঁহারা স্বীকার করেন না,—ইহকালের পরে আর কোন কাল আছে, তাহা মানিতে চাহেন না। বাহিরে যাহা দেখা যায়, ইহাই সর্ব্বস্ব—আর যেন কিছুই নাই। আমিত্ব আর কিছুই নহে, কেবল এই ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট শরীর, এবং মরণেই আমিত্বের শেষ। ধর্ম্ম, কল্পনা বই আর কিছুই নহে। এই কথাই চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতেছে। অর্থ বা ধর্ম্ম কেবল শরীরের সুখ। নাচ, গাও, খাও, এই জীবের মূল মন্ত্র। এই প্রকারে বাহির ধরিয়া লোকেরা কেবল বাহিরেরই পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বাহিরকে প্রত্যক্ষ পাইয়া কেবল সীমাবদ্ধ বাহিরেরই সম্মান করিতেছে! বাহিরে আরম্ভ করিয়া কেবল বাহির লইয়াই থাকিতেছে।

এই প্রত্যক্ষবাদ বা স্থূলবাদের প্রবল স্রোত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রত্যক্ষবাদের সংস্রব দোষে মানবসমাজের ধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে বাহির-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মটা এক প্রকার পোষাকের মত হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের আড়ম্বরে আরম্ভ, বাহিরেই ধর্ম্ম শেষ হইতেছে! বাহির ভিন্ন আর যাহা কিছু আছে, তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি যায় না। বাহির-নিরপেক্ষ সাধন-ভজন, কল্পনা বা স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় হইতেছে। এমনই এক দুর্দ্দশার দিন উপস্থিত হইয়াছে!! প্রাচীন ঋষিগণের স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্মত্বের সেই উজ্জ্বল মত, ক্রমে ক্রমে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। বল্কলময় নারিকেলের কঠিন আবরণ ভেদ না করিলে ভিতরের জলময় দুগ্ধের কোমল, সুস্বাদু, সারবস্তু বীজ-কোঁপল বা অনন্তের বিন্দু কি কখনও পাওয়া যায়? মানব-শরীরের ভিতরে প্রবেশ না করিলে, দয়া বল, আর ভালবাসা বল, নীতিবল আর পুণ্য বল, সাহস বল আর অধ্যবসায় বল, এ সকলের অস্তিত্ব কি পাওয়া যায়? কিন্তু হায়, বাহিরের কোলাহলে মজিয়া মানুষ ভিতরকে একবারে ভুলিয়া যাইতেছে, নীতিবলের পরিবর্ত্তে পশুবল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—দয়া বা প্রেমের বদলে দ্বেষ হিংসাবাণ নিক্ষিপ্ত হইতেছে,—সারের পরিবর্ত্তে অসারের পূজা জগতে দিন দিন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অসার বলিতেছি?—অসার বই কি! তোমার শরীর আর তোমার ইন্দ্রিয় কদিনের? বীজ ভিন্ন ফল কদিনের?—ফল বা সার ভিন্ন বৃক্ষই বা কদিনের? একবস্তু ভিন্ন রূপ ধরিবে—সকল রূপই অবিনশ্বর, সে পৃথক কথা। তোমার

ও আমার শরীরের অবশিষ্ট শ্মশানের ভস্ম যদি কেহ দেখে, তবে সে কিছু তোমাকে ও আমাকে দেখিল না। সুপক্ক আম্রফলের পরিবর্ত্তে, আম্রের পরিণতিতে যে মৃত্তিকা হইয়াছে, তাহা খাইলে কিছু আম খাওয়া হইল না। রূপান্তরের কথা ভিন্ন কথা। ভিতরের সার বস্তু বাদ দিলে,—জড় বা চেতন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না,— তুমি থাক না, আমি থাকি না। জীবনী-শক্তি বাদে, মানুষ, কৃমিকীটের আবাসভূমি বই আর কি? জড়ের ভিতরের শক্তিকে বাদ দিলে, জড়ই বা কি, বলিতে পার? কিন্তু এমনই হইয়া উঠিয়াছে,—বাহির-সর্ব্বস্ব জড়ের আদরই সর্ব্বত্র। মানুষের দৃষ্টি এমনই স্থূলদর্শী হইতেছে, ইন্দ্রিয়-লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুকেই সে মানিতে চাহে না। মানুষ, মানুষের ভিতরের পরিচয় চাহে না— বাহিরের পরিচয়ে অথবা বাহির দেখিয়াই সন্তুষ্ট। এই জন্যই দিন দিন ধর্ম্মসমাজ-সকলে ভয়ানক সাম্প্রদায়িকতা,—বাহ্যিকত্ব বা জড়ত্ব প্রবেশ করিতেছে। যে ব্যক্তি মানুষকে কেবল পৃথিবীর কোলাহলময় হাটে বাজারে, কেবল বাহিরে বাহিরে দেখিল, নির্জ্জন হৃদয় গৃহে একবারও দেখিল না, সে ব্যক্তি মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্বের কি পরিচয় পাইবে? চৈতন্যের বিশ্ব-ব্যাপিনী প্রেমকাহিনীর নিগূঢ় তত্ত্ব যে জানে নাই, সে গৌরাঙ্গের বাহ্য রূপ দেখিয়া তাঁহাকে কি চিনিবে? বিনয়-ভূষিত খ্রীষ্টের সাধুনীতির মূল কোথায়, যে জন তাহা না বুঝিয়াছে, সে জগতে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত মহাযোগীর মহাতত্ত্ব কি জানিবে? ভিতর না দেখার দরুণ মানুষ আর মানুষকে প্রকৃত অবস্থায় চিনিতে পারিতেছে না;—মানুষের বুকের ভিতরে মিলনের যে গভীর স্থান আছে, তাহা ধরিতে পারিতেছে না,—প্রেমের যে অপরূপ খনি আছে, তাহা পাইতেছে না। ব্যক্তিরই সমষ্টি, সমাজ। বিন্দু বিন্দু জল মিলিয়াই মহাসমুদ্র। ব্যক্তি ছাড়িয়া সমাজে যাই, সেখানেও দেখি, এক সমাজ অন্য সমাজের কেবল বাহির দেখিতেছে, এক দল অন্যদলের শরীর ও ইন্দ্রিয়-প্রসূত কেবল দোষ দেখিয়া মরিতেছে। হিন্দুসমাজ, খ্রীষ্টসমাজের কেবল বাহির দেখিয়া নিন্দা করিতেছে; মুসলমানসমাজ, হিন্দুসমাজের বাহির দেখিয়া ঘৃণা করিতেছে। হিন্দুতে আর খ্রীষ্টানে, মুসলমানে আর বৌদ্ধে কত বিবাদ বিসম্বাদ, কত কাটাকাটি চলিতেছে! ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে কত রক্তপাত হইতেছে! অথচ খুব চিন্তা করিয়া দেখিলে, এই যে বিবাদ বিসম্বাদ সোণার পৃথিবীকে ছারখার করিতেছে, ইহার মূল কারণ অতি সামান্য,—যেন কিছুই নহে বলিয়া মনে হয়;—সে সকল অধিকাংশ স্থলেই নশ্বর শরীরের স্বার্থ লইয়া। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া যেমন শিশুরা মারামারি করে, প্রবীণ লোকেরাও সেই প্রকার সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া কাটাকাটি করিতেছে। সামান্য একটু স্থানে অনৈক্য হইলেই, বা সামান্য একটু স্বার্থের হানি হইলেই কত ঘৃণার চক্ষে পরস্পরকে পরস্পরে দেখিতেছে। অথবা ভিতরে দৃষ্টি না থাকায়, ভিতরের আদর না থাকায়, মানুষ মানুষকে প্রকৃত রূপে না চিনিতে পারিয়া, কেবলই বিদ্বেষের আগুনে পুড়িতেছে। আজ কাল ধর্ম্মটা এক প্রকার কথা-কাটাকাটির উপায় হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বদই আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়,—প্রমাণ

পাই না, ঈশ্বরকে মানিব কি? অথচ সকলেই কোন রকমে একটা কিছু দল ধরিয়া আছেন। একজন পণ্ডিত বলিলেন,—“ঈশ্বরকে খুঁজিয়া দেখি, কিছুই বুঝিনা”,—অথচ তিনিই নাকি একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মপ্রচারক নামে জগতে বিখ্যাত হইতেছেন! কেহই কিছু বুঝি না, অথচ বাহিরে, বুদ্ধি খাটাইয়া একটা না একটা কিছু দাঁড় করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত! মানুষের মস্তিষ্ক-প্রসূত ধর্ম্মই সর্ব্বত্র দেখিতেছি। এইজন্য পার্থক্যও দেখা যাইতেছে। বুঝি না কেহই,—অথচ সকলেই ধার্ম্মিক! ধার্ম্মিক সকলেই, অথচ পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা, মারামারি কাটাকাটি, অশান্তি অপ্রেম ঘুচিতেছে না। এ যে কি বিষম অবস্থা, চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়। মানুষের এমনই অহঙ্কার, ক্ষুদ্র হইয়াও, আপনার জ্ঞানে বা বুদ্ধিতে, তর্কে বা যুক্তিতে সে ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করিবেই করিবে। বামন হইয়া মানুষ চাঁদ ধরিবে! কিন্তু হায়, মানুষ চাঁদ ধরিতে যাইয়া জোনাকী ধরিতেছে;—প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া—মানুষ আজ এক সোণার চাঁদকে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিত্র করিয়াছে, একবার দেখ। মুসলমানের আল্লা আর যোগীর ঈশ্বর, খ্রীষ্টানের গড আর বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ, আজ কত বিভিন্ন রূপে জগতে পরিচিত! মূলে এক হইয়াও আজ ধর্ম্ম কত পৃথক পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের কূটবুদ্ধি পরিচালনার ফল এ নহে, তুমি বলিতে পার? সুস্থভাবে চিন্তা কর, প্রত্যক্ষবাদ বা বাহিরবাদ, প্রমাণবাদ, বা জড়বাদ জগতের কি মহা অনিষ্ট সাধিতেছে, বুঝিতে পারিবে। তর্ক যুক্তিতে যে ঈশ্বর-বিশ্বাস জন্মে, তাহাকে আমরা বিশ্বাস বলি না, সে কল্পনার ক্রীড়া—মস্তিষ্কের খেলা। লোকের বুদ্ধি শক্তির তারতম্য অনুসারে, সে বিশ্বাস রূপান্তরিত হয়। জ্ঞানীর ঈশ্বর আর মূর্খের ঈশ্বর—পৃথক হইয়া পড়ে। তাই হইয়াছে, এই পৃথিবীতে। ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তাই কত কাটাকাটি চলিতেছে। বাস্তবিক মানুষ যতদিন ভিতরে চাহিয়া না দেখে, ততদিন সারবস্তু সে পায় না। মাটির শরীরের ভিতরে চিন্ময়ী যে আত্মা বিরাজিত, যে কেবল মানুষের বাহির লইয়াই রহিল, সে তাহা কিরূপে বুঝিবে, কিরূপে জানিবে? আবার ঐ চিন্ময়ী আত্মার মূলে যে পরমাত্মার অরূপ-রূপ-মাধুর্য্য মিলিয়া রহিয়াছে, তাহাইবা সে কি বুঝিবে? এক স্থানে অসার ও সার মিলিত রহিয়াছে! অসারের ভিতরে সারের ঘনীভূত যোগ রহিয়াছে। জড় শরীরে চিন্ময়ী আত্মা, চিন্ময়ী আত্মার মূলে জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা। অরূপ জমিয়া সেখানে রূপ হইতেছে, অসীম ঘুচিয়া সেখানে সীমা পাইতেছে। বহির আবরণের ভিতরে এক অপরূপ,—ভিন্নরূপ। দুই যেখানে এক হইয়াছে,—জড় আর চিৎশক্তি সেখানে মিলিয়াছে, সে যে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মিলনের স্থল, জড়বাদী বা প্রত্যক্ষবাদীর চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না। প্রত্যক্ষবাদী পরমাণু দেখিয়াই নীরব হয়, পরাজিত হয়, মাটির শরীর দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু ভিতরবাদী বা বিশ্বাসবাদী, প্রেমবাদী বা সাম্যবাদী, এক চিন্ময়ীরূপ, এক মনোমোহন শক্তি-তরঙ্গ প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে অবিনশ্বর ভাবে বিরাজিত আছে, অলক্ত দেখিতে পান। ভাষায় তাহা কি ব্যাখ্যা করিব?

বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিলে, সকলেই দেখিতে পান; সেখানে কি এক মহৎ ইচ্ছা শক্তির কার্য্য অবিরত চলিতেছে,—সেখানে কি এক মনমোহন প্রেমখনির কারখানা খোলা রহিয়াছে। আমার ইচ্ছা নাই, অথচ শরীরে রক্ত চলিতেছে; ইচ্ছা নাই, অথচ পাকস্থলীতে, প্লীহাতে, যকৃতে, ফুসফুসে, এবং হৃদয়যন্ত্রে অবিরত কল চলিতেছে। আমার ইচ্ছা নাই, অথচ বাহিরের জ্ঞান মস্তিষ্কে স্থান পাইতেছে। ইচ্ছার উপরে এক মহৎ ইচ্ছার রাজত্ব বিস্তৃত হইতেছে, আত্মার মূলে কি এক অবিনাশী শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা যাইতেছে। সকলেই কি সেই মহতী শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন? আত্মদর্শী, ভিতরদর্শী ব্যক্তিরা সকলেই বুঝিতে পারেন। অথবা যাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। ঘড়ির কাটা চলিতেছে, যে দৃষ্টি ফিরায়, সেই দেখে। মানুষ এমনই বধির যে, বুদ্ধি প্রসূত নশ্বর জ্ঞানের কথা শুনিতেছে কিন্তু সে অবিনশ্বর ধ্বনি শুনিতেছে না। সম্প্রদায় হইবে না, কেন? মিলনের প্রকৃত স্থানে না মিলিয়া মানুষ কেবল বাহিরে মিলিতেছে, বাহিরের শব্দে কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে, তাই মানুষ সে স্বর শুনিয়াও শুনে না। ভিতরের শব্দ শুনিতে পারে—সকলেই। শুনিয়াও তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি, মায়ামোহের দাসত্বে আবদ্ধ থাকিয়া তাহাকে তুচ্ছ করিতে পারি, কিন্তু সকলেরই ভিতরে অবিরত সে শব্দ হইতেছে! অশব্দ অরূপ যেখানে রূপ ধরিয়া শব্দ করিতেছেন, ক্ষুদ্র মানুষ তাহা মানুষকে কি বুঝাইয়া দিবে? তিনি আপনি সর্ব্বত্র স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ আপনি আপনাকে সর্ব্বপ্রাণে প্রকাশ করিতেছেন। মানুষের সাধ্য নাই, তাঁহাকে ব্যক্ত করে। ভিতরের দিকে চাহিয়া, গৃহে বসিয়া, মায়ের জীবন্ত মূর্ত্তি আপন চক্ষে না দেখিয়া যেজন লোকের তর্ক যুক্তিপ্রসূত মাকে দেখিতে চায়, সে ভ্রান্ত; মাতার প্রকৃত স্বরূপ কখনই সে বুঝিতে পারিবে না। মানুষের বাক্য মন যাঁহাকে ধারণাও করিতে পারেনা, তাঁহাকে মানুষ আর কি প্রকাশ করিবে?—পারে না, পারে নাই, পারিবে না। ইতিহাস পাঠ কর,—ধর্ম্মান্দোলনের মূল তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, দেখিবে, বুঝিবে, মানুষ মানুষের নিকট ঈশ্বরতত্ত্ব অতি অল্পই জানিয়াছে;—যাহা জানিয়াছে, তাহা মানুষের কল্পনার ঈশ্বর,—মস্তিষ্কের দেবতা, তাহা সার বস্তু হইতে কত বিভিন্ন, কত পৃথক। অথচ মানুষের এমনি প্রকৃতি, মানুষ ভিতরে একবারও চাহিবে না, একবারও কাণ পাতিয়া সে শব্দ শুনিবে না! বিশ্বেশ্বরীর অপরূপ যেখানে চিত্রিত, চিন্ময়ীর মহামিলন যেখানে, সে দিকে ভ্রমেও চাহিবে না! মানুষ মানুষের কথা শুনিবে,—কুসংস্কারের পূজা করিবে,—অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ড মানিবে, অথচ ভিতরে যে চিদ্ঘন আনন্দ বিরাজিত, সে দিকে চাহিবে না! তাই দেখ, আজ পৃথিবীতে কতই বিচ্ছেদ, কতই অমিলন, কতই বিবাদ বিসম্বাদ,—বিদ্বেষ, ঘৃণা। দার্শনিক পণ্ডিতের নাম লইতে চাও, এবং আপনি দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিতে চাও, কিন্তু একবার বলত, সসীম তুমি, সে অনন্তগভীর তত্ত্ব কি প্রচার করিতে পার, সে তত্ত্বের আর কি প্রমাণ দিতে পার?

তিনি স্বপ্রকাশ, ইহা ভিন্ন আর তাঁর কি প্রমাণ আছে? নিজে যে অজ্ঞান, সে জ্ঞানময়কে কি প্রকাশ করিবে?—নিজে যে অসিদ্ধ, সে সিদ্ধ-পুরুষকে কি ব্যাখ্যা করিবে? জ্ঞানী নিউটনকে কি একজন সামান্য মূর্খ কৃষক প্রকৃত রূপে প্রচার করিতে পারে? কখনই নহে। একবিন্দু যাহা পারে, তাহার সহিত নিউটনের কত প্রভেদ! নিউটনকে সে নিজের বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে না। বালক নিজে বৃদ্ধের তত্ত্বকথা কি বলিবে? যে বলিতে চায়, লোকে তাহাকে জ্যেঠার শিরোমণি বলে। যে দর্প করিয়া সামান্য বুদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রমাণ দিতে চায়, সে আপনি প্রমাণহীন,—সে আপনি আপনার বুদ্ধির পাকে ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রকৃত ঈশ্বর-তত্ত্বের নিকট দিয়াও যায় না। সে সে গভীর তত্ত্বের প্রমাণ দিতে যায়, সে কিছুই জানে না। প্রমাণহীনের প্রমাণ অসিদ্ধ, জ্ঞান হীনের জ্ঞান প্রচার মিথ্যার ক্রীড়া, প্রেম-হীনের প্রেমকাহিনী প্রচার কল্পনার কথা। প্রকৃত প্রেমিক, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, প্রকৃত সিদ্ধ-পুরুষ বলেন, "—তিনি আপনি প্রকাশিত না হইলে কিছুই জানিতে পারি না;—বলেন, শুনি বটে একজনের কথা, কিন্তু কি শুনি বলিতে পারি না, দেখি বটে এক জীবন্ত মহাপুরুষকে আত্মার মূলে বিরাজিত, কিন্তু কি যে দেখি, বলিতে পারি না;—অরূপ সাগর দেখি বটে, কিন্তু ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করিতে পারি না।" বুদ্ধি মন, জ্ঞান বিদ্যা, সকল সেখানে পরাস্ত হয়। সামান্য সসীম সাগরের ব্যাখ্যা হয় না, সসীম মানুষের ব্যাখ্যা হয় না,—জড়ের ব্যাখ্যা হয় না, আর সেই অনাদি, অনন্ত, ভূমা, মহান, অপার, অসীমের ব্যাখ্যা হইবে? ভুল কথা। যে ব্যাখ্যা করে, সেও মূর্খ, প্রতারক; যে সে ব্যাখ্যা শুনে, সেও অজ্ঞান,—নির্বোধ। তবে কি ধর্ম্ম জগতে টিকিবে না? তবে কি ঈশ্বর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন না? একথাও যে মনে ভাবে, সেও মূর্খ। ধর্ম্ম অবিনাশী, অবিনশ্বর। সমস্ত জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে,—সাগর পর্ব্বতে পরিণত হইতে পারে, এবং পর্ব্বত সাগরের বেশ ধরিতে পারে,—রাজার রাজসিংহাসন টলিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্ম চিরস্থায়ী,—অবিনাশী, অবিনশ্বর। ঈশ্বর আপনি স্বপ্রকাশ, আপনিই শিক্ষক, আপনিই প্রচারক, আপনিই গুরু, আপনিই নেতা! তিনি আপনি আপনাকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার দুর্জ্জয়বাণী সতত আত্মার ভিতরে নিনাদিত হইতেছে। সে বাণী শুনিয়া রাজা কম্পিত হইতেছেন, কৃষকের প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিতেছে! আমি তুমি সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই স্বরূপে নিমগ্ন রহিয়াছি। যখনই ভিতরে যাইতেছি, কি এক মহা-বাণী শুনিতেছি। অনেক সময়ে বাহিরে থাকিতেছি বটে, কিন্তু যখনই ভিতরে যাই, কি এক দুর্জ্জয় মহাশক্তির তরঙ্গ দেখিতে পাই। আবার প্রমাণ কি?—ইহাই জ্বলন্ত প্রমাণ। মিথ্যা কথা নয়, কল্পনার কথা নয়, প্রবঞ্চনার কথা নয়, কিন্তু নিত্য সত্য, জাগ্রত সত্য। তাঁহাকে ভিতরে যেভাবে যে দেখিতে পায়, সেই ভাবেই সে পূজা করুক, বিশ্বাস করুক, পৃথিবীর কিছুই অনিষ্ট হইবে না। যে তাঁহাকে যেরূপে, যে স্বরূপে দেখিতেছে, সরল প্রাণে, অকপট ভাবে সে সেই স্বরূপের পূজা করুক, কখনও সম্প্রদায় থাকিবে না। যে সাগরের

কূলে তুমি, সেই সাগরের কূলেই আমি ;— অমিলনেও গভীর যোগ, গভীর মিলন! জ্ঞানী যদি বিশ্বাসী হয়, তবে প্রেমিক-বিশ্বাসীর সহিত তাঁহার অমিল থাকে না, আর কর্ম্মী যদি বিশ্বাসী হয় তবে ভক্তের সহিত অমিল থাকে না।—এক মাত্র বিশ্বাসে বহুর মিলন সংসাধিত হয়। যে জন তাঁহার দুর্জ্জয় বাণী শুনে নাই, সে যেন কখনও ভণ্ড হইয়া ধর্ম্মের নাম মুখে আনে না। যে ব্যক্তি সে স্বর শুনে নাই, সে যদি অবিশ্বাসী থাকিয়া থাকে, তাঁহাকে নিন্দা করিও না। ঈশ্বরকে না বুঝিয়া, না জানিয়া, জানিয়াছি, বুঝিয়াছি বলার অপেক্ষা আর মহা পাপ নাই। যে ব্যক্তি আপন গৃহকে সেই অরূপ রূপের আলোকে আলোকিত দেখে নাই, সে যেন লোকের মুখে প্রমাণের কথা শুনিয়া ঈশ্বরের কথা না বলে। সর্প লইয়া খেলা? আগুন লইয়া ক্রীড়া? না ধরিয়া, না বুঝিয়া, ধরিয়াছি, পাইয়াছি বলার ন্যায় মহাপাপ আর নাই। ধর্ম্মের প্রথম উপদেশ এই, মানুষ বাহির পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করুক—নীরবে গম্ভীর স্থানে, নির্জ্জন আত্ম-অরণ্যে প্রবেশ করুক। সেখানে অরূপের সহিত সাক্ষাৎ হইবে—অশব্দের শব্দ শ্রুত হইবে, অস্পর্শকে স্পর্শ করা যাইবে,—সকল অসম্ভব সম্ভব হইবে। শুনিয়া, স্পর্শ করিয়া, সাক্ষাৎ করিয়া, তবে ধর্ম্ম ধন লাভ হইবে। নচেৎ কি অমূল্য ধর্ম্ম-ধন পাওয়া যায়? এ ত কল্পনার কথা নয়;—নিত্যসত্য, জলন্ত সত্যের কথা। কেহ কেহ বলেন, প্রত্যক্ষবাদীর দল এতই প্রাধান্য লাভ করিতেছে যে, বুঝি বা ধর্ম্ম আর জগতে টিকিবে না। আমরা বলি, ভয় কি? মানুষের চেষ্টা বড়, না ঈশ্বর বড়? মানুষের সাধ্য কি যে, সে স্বপ্রকাশকে কুসংস্কার বা কুজ্ঞানে চিরকাল ঢাকিয়া রাখিবে? আমার তোমার ভিতরে যাঁহার করুণাস্রোত অবিরত প্রবাহিত, তিনি কি জগৎকে ভুলিয়া রহিয়াছেন? —থাকিতে কি পারেন? তাঁহার পক্ষে এ সকল অসম্ভবের অসম্ভব। ভয় নাই—আপনাকে তিনি আপনিই চিরকাল প্রচার করিয়াছেন, চিরকাল করিবেন। কে এমন শক্তিবান পাপী, অবিশ্বাসী আছে, যে ভগবানের রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে? সর্ব্বদর্শীর নিকট সকলই প্রকাশিত। তিনি আমাকে ধরিবেন, তোমাকে ধরিবেন,—জগৎকে ধরিবেন। বাহির লইয়া অন্ধ হইয়া আছি যতক্ষণ, ততক্ষণ কিছুই দেখিতেছি না বটে,—শরীরের বিলাস সুখ, ভোগ বিলাস, মায়া মোহ, অবিদ্যা অজ্ঞানে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ বুঝিতেছি না বটে; কিন্তু যখনই ভিতরে দৃষ্টি পড়িবে, অমনি ধরা পড়িব। চিন্তাহীন, বিশ্বাসহীন, তর্কযুক্তির দাস হইয়া চির দিন কখনই থাকিতে পারিব না। আজ আমার সামান্য জ্ঞানে তোমাকে বাঁধিতে চাহিতেছি বটে, কিন্তু যখন অনন্ত জ্ঞান সাগরে ডুবিব, তখন আর এ ভাব থাকিবে না। যখন বাঁধা পড়িব, তখন আর বাহির হইব না। কিন্তু সে দিন কবে আসিবে? সে দিন কবে আসিবে, যে দিন বিদেশ পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া গৃহে যাইয়া মায়ের মুখ দেখিব। সে দিন কবে আসিবে, যে দিন ক্ষুদ্র বুদ্ধি-প্রসূত অহঙ্কারের পূজা পরিত্যাগ করিয়া, ভিতরে যাইয়া, আনন্দময়ীর অনন্তক্রোড়ে শুইয়া ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র হইয়া যাইব! সে দিন কবে আসিবে, সে

নিন বাহিরের অন্তরালে সেই চিৎ শক্তির অস্তিত্ব জ্বলন্ত রূপে দেখিতে পাইব! প্রমাণ লইয়া, তর্ক যুক্তি লইয়া কাটাকাটি করিলে আর কি হইবে! সময় যথেষ্ট গিয়াছে,—এস, একবার সকলে হৃদয়-কাননে প্রবেশ করি। রূপাময়ীকে প্রত্যক্ষ না দেখিলে কখনই আমরা সম্প্রদায় বা দল ভুলিতে পারিব না। যে প্রেম-খনিতে আমরা মিলিত হইব, অগ্রে তাঁহাকে প্রাণে দেখি। তিনি ত প্রাণের মূলে। বাহিরের ভিতরেই প্রাণ, প্রাণের মূলেই তিনি। জড়ের ভিতরে তিনি, জীবের ভিতরেও তিনি। তাঁহারই ইচ্ছাশক্তির কার্য্য সতত সর্ব্বত্র হইতেছে। তাঁহারই ইচ্ছা শক্তির বিকাশ, জড়ে এবং জীবে। তাঁহারই ইচ্ছার সমষ্টি, জড় বা জীব। মজিব কেন?—ভুলিব কেন?—অবিশ্বাসী হইব কেন? তোমার কল্পনার কথা শুনিব কেন? যাহা না দেখিয়াও দেখা যায়, না বুঝিয়াও বুঝা যায়, যাহা না ধরিয়াও ধরা যায়, তোমার কল্পনার প্রমাণে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিব? বায়ুকে যেমন না দেখিয়াও স্পর্শ করা যায়, তাঁহাকেও সেইরূপ স্পর্শ করা যায়; বিদ্যুৎ কি পদার্থ না জানিয়াও যেমন তাহার কার্য্য দেখা যায়, সেইরূপ তাঁহাকে স্থষ্টির মূলে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অব্যক্ত হইলেন, তাহাতে কি? বায়ু নিত্য সত্য, বিদ্যুৎ নিত্য সত্য; ব্যাখ্যা হয় না বলিয়া কি ইহাদিগকে অস্বীকার করিতে পার? শরীরের ভিতরে আর কিছুর অস্তিত্ব না থাকিলে, তুমি ও আমি শ্মশানের ভস্ম। সে কিছু যে কি, তাহা জানি না, ব্যাখ্যা করিতে পারি না বলিয়া কি সত্যকে অস্বীকার করিব? জীবন্ত খেলা, জীবন্ত লীলা দেখিয়াও মানুষ কেমনে অবিশ্বাসী থাকিবে? হৃদে প্রবেশ করিলেই আত্মার মূলে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ লাভ। তাঁহাকে যে দেখিয়াছে, তাঁহাকে যে বুঝিয়াছে, সে বিবাদও জানে না, বিসম্বাদও জানে না, ঘৃণাও জানে না, বিদ্বেষও জানে না। সাক্ষাৎ লাভ হইলে—ভিতর ও বাহির এক হইয়া যায়। ভিতরই বাহির, বাহিরই তাহারি নিকট ভিতর হয়। সে যখনই ভিতরে যায়, এক জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ সর্ব্বক্ষণ দেখে। দেখে আর তাঁহাতে নিমগ্ন হয়, নিমগ্ন হয় আর তাঁহাকে দেখে। তাঁহার নিকট রাজা প্রজা, পাপী পুণ্যাত্মা, জ্ঞানী মূর্খ, বিষ্ঠা চন্দন, সকল একাকার হইয়া যায়। একই রূপ, একই ভাব, একই চিন্তা। একই ধ্যান, একই জ্ঞান। একই ধর্ম্ম, একই বস্তু, সকলের ভিতরে সে দেখে। ভাল মন্দ সকলের ভিতরেই এক জনকে সে দেখে। পৃথিবীর বাজারে মত লইয়া সে ঝগড়া বিবাদ করে না, আপনার সত্যে আপনি অটল হইয়া বসিয়া থাকে। সে মনে করে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইলে কুসংস্কার বা কুজ্ঞান, মানুষের মধ্যে থাকিবে না, তবে কেন ভেদাভেদ মানিব? একই শক্তির রূপান্তর,—সাগর পর্ব্বত, নরনারী, জীবজন্তু, কীট পতঙ্গ, সকল। ছোট বড়, এ ভেদাভেদ আর তখন তাঁহার থাকে না। মাটী সোণা, এক হয়। সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ এক হয়;—সে অভেদাত্মক মহাযোগী মহাধ্যানে, মহা জ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন;—নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হন। তিনিই চৈতন্য, তিনিই বুদ্ধ, বা তিনিই খ্রীষ্ট নামে পৃথিবীতে সাম্যাবতার বলিয়া পূজিত

রা সম্মানিত হন। মানুষ যদি সে মহাধনকে পায়, তবেই জগতের নরনারীর ভিতরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, সকলের সহিত অভেদাত্মক হইতে পারে, আসক্তিহীন হইয়াও মজিতে পারে—সকলকে কোলে তুলিয়া,হৃদয়ে পুরিয়া নৃত্য করিতে পারে। প্রেম-খনি যাহার আবিষ্কার হয় নাই, সে মরণের কোলে, শুষ্কত্বের শ্মশানে, তর্ক যুক্তির ভস্মে নিমগ্ন রহিয়াছে। যে, তাঁহাকে স্পর্শ করে, সে তাঁহাকে দেখে, সেই মিলনের মন্ত্র পায়;—সেই জ্ঞান প্রেম, নীতি পুণ্য—প্রকৃত ধর্ম্ম ধন পায়। ঈশ্বর এই করুন, আমরা তাঁহাকে জীবনের মূলে জীবন্ত ভাবে দেখিয়া প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত হইতে পারি। ঈশ্বর এই করুন, সম্প্রদায়গত তর্কযুক্তি-প্রধান মতের ঝগড়া-বিবাদ পৃথিবীর বক্ষকে পরিত্যাগ করুক;—সকলে পরস্পরের ভিতরের সৌন্দর্য্য দেখিতে পারি;—শরীরের ভিতরে লুক্কায়িত অনন্ত সুক্ষ্ম সার বস্তু দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। কেবল খোসা, কেবল অসার, কেবল বাহির, কেবল মত,—কেবল ঝগড়া লইয়া কি হইবে? এই করুন, স্থূল শরীরের ভিতরের অনন্তজ্ঞান, অনন্ত শক্তিতে ডুবিতে পারি। এই করুন, সকলে অনন্তে ডুবিয়া একাত্মক হইয়া শান্তির রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ হই এবং ইচ্ছার ভিতরে ইচ্ছার জয় দেখি, জড়ের ভিতরে চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া তাহাতে নিমগ্ন হই!

ইন্দুবালা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইন্দুবালা এখন শ্বশুরালয়ে। মনকে যতদূর পারেন, কর্ত্তব্যের পথে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বামীকে সুখী করিবার জন্য, সমুদয় পরিবারের সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য, অনভ্যস্ত কঠোর পরিশ্রম অম্লান বদনে সহ্য করিবার জন্য, সতত আপনাকে শিক্ষিত করিতেছেন। নিজের হৃদয়ের সহিত সতত সংগ্রাম করিয়া, কঠোর বিবেকের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। এখন তাঁহার মুখশ্রীতে কেমন এক গম্ভীর, সহিষ্ণু, প্রশান্ত ভাব বিরাজিত। এখন তিনি দুঃখের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্ম-শিক্ষা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইন্দুবালার দুর্ভাগ্য বশতঃ এই শিক্ষা সমাপ্ত হইল না। পাঁচ মাস পরে তাঁহার পীড়া হইল। চিকিৎসার দোষেই হউক, অথবা মানসিক পীড়ার জন্যই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, রোগ ক্রমে সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিল। এক মাস পরে তাঁহার জীবন-দীপ নিবু নিবু হইল। তখন তাঁহার পিতার নিকট সংবাদ আসিল। ইন্দুর ভ্রাতা নির্ম্মল তাহাকে লইতে আসিলেন। দেখিলেন, ইন্দু মৃতপ্রায়। তিনি দেখিয়া কাঁদিলেন; প্রয়োজনীয় আয়োজন করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইলেন। ইন্দুবালার পিতা ধনী। বড় চিকিৎসক দিয়া দেখাইতে লাগিলেন। চিকিৎসকেরা বলিলেন, জলভ্রমণ করিলে বিশেষ উপকার হইবে। জল-যাত্রার ব্যবস্থা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সায়ংকাল নিকট। ভাগীরথী তীরে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা ধীরে ধীরে উজান বহিয়া যাইতেছে। বাহিরে ইন্দুবালা বিছানার উপর বালিশ ঠেক দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার কাছে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা বসিয়া আছেন। ভ্রাতার হাতে একখানি সংবাদ পত্র ও পুস্তক। ইন্দুবালার শরীর অনেক সারিয়াছে, কিন্তু বদনপাণ্ডুবর্ণ, দেহ জ্যোতিহীন,—দুর্ব্বল। তথাপি তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য, অতুলনীয় লালিত্য কেমন এক মধুর ভাবে প্রতিভাত হইতেছিল,—লঘু আকৃতিতে কেমন ধীর মাধুরী লক্ষিত হইতেছিল। ইন্দুবালার ভ্রাতা একখানি বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িতেছিলেন, ইন্দুবালা তাহা শুনিতেছিলেন। ক্রমে নির্ম্মল দেখিলেন, ইন্দু অন্যমনস্কা হইয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার ভ্রাতা পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিলেন,—"ইন্দু, তোমার কি কোন অসুখ করিতেছে?" ইন্দুবালা একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"না।" নির্ম্মল বলিলেন—"এই স্থানটী বড় সুন্দর বোধ হইতেছে।" নদীর দুই ধারে কোথাও বা রমণীয় হরিতক্ষেত্র, কোথাও বা কৃষক ধীরে ধীরে এখনও হলচালনা করিতেছে, কোথাও বা রমণীয় কুঞ্জ শাখা-লতা তটিনী-তীর-লগ্ন তরঙ্গকে চুম্বন করিতেছে। দূরে কোথাও বা একটী গাভী, কোথায়ও একটী ছাগ, কোথায়ও বা কৃষক পল্লীর অস্পষ্ট ছায়া, আর দূরে কোথায়ও বা উন্নত সৌধমালা, কোথায় বা দেবমন্দিরের চূড়া আকাশ পটে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। মেদিনী মনমোহন ভাব ধারণ করিয়াছে—সেই মৃদু কলনাদিনী তরঙ্গিণী—সেই মন্থরগতি তরঙ্গ—আর সেই লোহিত প্রশান্ত আকাশ, আর সেই চতুর্দ্দিকস্থ—কোমল নিস্তব্ধতা। ইন্দু ও নির্ম্মল, দুই জনে সেই প্রশান্ত সৌন্দর্য্য নীরবে দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে ইন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা, আমরা এলাহাবাদে কত দিনে পঁহুছিব?"

নির্ম্মল।—"বোধ হয় আর এক মাসে।"

ইন্দু।—"এত দিন?"

নির্ম্মল।—"তোমার জলভ্রমণ কি কষ্টদায়ক বোধ হইতেছে?"

ইন্দু।—"অনেক দিন বাটী হইতে আসিয়াছি। বাটীর সকলকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, আর আমার যে পীড়া তাহাতে কতদিন বাঁচিব, তাহার কিছু স্থির নাই।"

নি।—"কেন, তোমার পীড়া ত প্রায় সারিয়া গিয়াছে।"

ই।—অস্ফুটস্বরে, "এপীড়া কি সারিবার?"

নি।—"ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, তাত তুমি জান, তোমার পীড়ার আর কোন আশঙ্কা নাই।"

ই।—"দাদা, সিমলা কেমন জায়গা?"

নি।—কেন, তোমার সেখানে যাইতে ইচ্ছা করে?"

ই।—"হাঁ, আমার ঐসকল স্থান দেখিতে খুব ইচ্ছা হয়।"

নির্ম্মল শুনিয়াছিলেন, পরিব্রাজক সিমলার নিকটস্থ কোন স্থানে কিছুকাল পূর্ব্বে বাস করিতেন। তিনি কোন উত্তর করিলেন না। কেবল একটামাত্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ইন্দু কতক্ষণ পরে বলিলেন,—"দাদা, অদ্য প্রাতে সংবাদপত্রে একটী বাঙ্গালী বক্তার বিষয় কি পড়িতেছিলেন?"

নির্ম্মল।—“আমি কি সে প্রবন্ধটা আবার পড়িব?”

ই।—“না, আমার হাতে দিন, আমি নিয়ে পড়িতেছি।” এই বলিয়া তিনি সংবাদ পত্র খানি লইলেন। তিনি সেইটী নিজে পড়িতে লাগিলেন।

“নগর (পঞ্জাবে) কয়েক দিবস হইল একজন বাঙ্গালী আসিয়াছেন। ইনি গত শনিবারে রাজশাসন ও জাতীয় উন্নতির বিষয়ে হিন্দি ভাষায় একটী চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহার বাগ্মিতা অসাধারণ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কণ্ঠধ্বনি মধুর ও সুদূরশ্রুত, মূর্ত্তি গম্ভীর ও কঠোর।——সংবাদপত্রে রাজপুতনার——রাজ্যের বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে যে কয়েকটী তেজপূর্ণ প্রবন্ধ সম্প্রতি বাহির হইয়াছিল, অনেকে বলেন, ইহারই লেখনী হইতে তাহা নিঃসৃত। কেহ কেহ বলেন, ইনি বাঙ্গালী। ইনি যে দেশীয়ই হউন, এখন দেখিতে সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী, অতি বিশুদ্ধ হিন্দি কহিয়া থাকেন। ইহার বক্তৃতাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আগামী শনিবারে “ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, ইনি আর একটী বক্তৃতা করিবেন।”

ইন্দু পড়িয়া বলিলেন—“দাদা, ইহার পরের তারিখের কাগজ খানি কোথায়?”

নির্ম্মল।—উহার “পরের কাগজ পাওয়া যায় নাই”।”

ইন্দু।—“আপনার কি বোধ হয়, এই লোকটা বাঙ্গালী?”

নির্ম্মল।—“হইতেও পারে।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরিব্রাজক রাজপুতনার সেই রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া পঞ্জাবে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই রাজপুত রাজ্যের ‘রেসিডেণ্টে’ সাহেবের সহিত রাজার একটু সংঘর্ষণ হয়। তাহাতে রাজা পরিব্রাজকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরিব্রাজক সেই কার্য্য উদ্ধারের জন্য কলিকাতায় আসিবেন স্থির করিলেন। প্রথমে এলাহাবাদে আসিলেন; সেখান হইতে জলপথে যাত্রা করিলেন। বর্ষাকাল নৌকা সোঁ সোঁ করিয়া যাইতে লাগিল। একদিন অপরাহ্নে দেখিলেন, একখানি নৌকা উজান বহিয়া আসিতেছে। নৌকার ভিতর একটী স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন। ক্ষণকাল পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার নৌকা দূরে যাইলে রমণীটী আস্তে আস্তে নৌকার বাহিরে আসিলেন, ততক্ষণ পূর্ণ ভাগীরথী হৃদয়ে তাহার নৌকা নাচিতে নাচিতে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে। তখন পরিব্রাজক একটী দূরবীণ লইয়া দেখিতে লাগিলেন। চিনিতে পারিলেন,—ইন্দুবালা। কৃশ, পীড়িত—ইন্দু। ইন্দু তাঁহাকে পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, বাহিরে আসিয়া দেখিতে দেখিতে পরিব্রাজকের দূরবর্ত্তী মূর্ত্তি ও নৌকা ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইন্দু নিজের মাথা ধরিয়া বসিলেন। নির্ম্মল, ইন্দুর ভাবান্তর দেখিয়া বলিলেন—“ইন্দু, ইন্দু, কি হইয়াছে?”

ইন্দু বলিলেন—“কিছু নহে।”

এদিকে পরিব্রাজক শীর্ণা ইন্দুকে দেখিয়া ও চিনিয়া আবার ক্ষিপ্তপ্রায়। কিন্তু তিনি হৃদয়ের অসাধারণ বল প্রয়োগ করিয়া রাজকার্য্য সমাধা পূর্ব্বক আবার নিভৃত হিমাচল কুটীরে আশ্রয় লইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরিব্রাজক আবার সেই তুষারময় হিম-

গিরিশিখরে। সেই বিজন কুটীরে, প্রধূমিত হৃদয়ে, কখন মুদিতনয়নে ধ্যান-মগ্ন; অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"জানামি ধর্ম্মং ন চমে প্রবৃত্তি
জানাম্য ধর্ম্মং ন চমে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদয়স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কতকগুলি জীর্ণ পত্র একটী পুঁটলী হইতে বাহির করিলেন। বলিয়া দিতে হইবে না, এই পত্র গুলি ইন্দুবালার। আমরা ইহার মধ্যে কেবলমাত্র একখানি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

স্নেহময় পূজাতম দেব—

"কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য" আমাকে বলা বৃথা। আমি কি অকর্ত্তব্য করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারি না। আমি আপনার গদের যুক্তি অনুভব করিতে পারি না—উপদেশ বুঝিতে পারি না। আমার তরল বুদ্ধি, হয়ত বলিবেন। আমি দুর্ব্বল, শতবার স্বীকার করিতেছি, কিন্তু আপনি কি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন না? আমি বুঝিতে পারি, স্রোতে যতই গা ঢালিয়া দিব, ততই ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, অবশেষে অকূলসাগরে ফেলিবে। সংসার দেখিতেছি, প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় কঠোর বিধি অনুভব করিতেছি, ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারময়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। তথাপি অবোধ মন দৃঢ় করিতে পারিতেছি না। যাহা আপনার অভিমত, তাহাই হইবে। অশিক্ষিত জীবন আমার। লিখিবার ভাষা পাইতেছি না। সমুদায় কথাগুলি যেন একবারে উথলিয়া উঠিতেছে, তাহাতে সকলই ভুলিয়া যাইতেছি। যাঁহাকে অনন্তকাল দেখিলেও আমার তৃপ্তি হয় না, তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা কিরূপে হ্রাস করিতে পারি? সমুচ্ছ্বাস মনুষ্যের আজ্ঞায় থামিয়া যায় না। আপনি বলিয়াছেন, 'হৃদয়কে সংযত কর, আপনার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, স্রোতে ভাসিয়া যাইও না, অনন্তকালের নিমিত্ত দুঃখরাশি সঞ্চয় করিও না।' আপনি আরও লিখিয়াছেন—'ইন্দু, সাবধান, দুরাশা হাল ছাড়িয়া দিও না, দিলেই সর্ব্বনাশ হইবে। জড় কিছু চিরকাল রহে না, আকাশ চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, সমুদ্র চিরকাল উত্তাল তরঙ্গে ক্ষিপ্ত রহে না, তোমার বুদ্ধি আছে, তোমার শিক্ষা আছে, তোমার নীতির বল আছে। তবে কেন হতাশ হইবে, তবে কেন হৃদয়কে মরুভূমি করিবে, তবে কেন অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবিবে? তুমি পতিসেবায় ও গৃহকার্য্যে, পুস্তকে ও ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া আমাকে ভুলিয়া যাও।'"

—জীবনপতি আপনি যাহা লিখেন, তাহাই আমার নিকট মধুর, চমৎকার। কিন্তু আপনার উপদেশ কেমন যেন অসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে, কেমন যেন নিষ্ঠুর বোধ হইতেছে। আপনাকে ভুলিয়া যাইব? আপনাকে ভুলিয়া যাইলে আমার কি পাপ হইবে না? জীবন থাকিতে আপনাকে ভুলিতে পারিব না। প্রভু, এইখানে আপনার আদেশ আমি পালন করিতে অসমর্থ, ক্ষমা করিবেন।

অনন্ত শোকে, অনন্ত দুঃখে দুর্ব্বলমন ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহা সহ্য করিয়াছি। কিন্তু প্রভু, আপনার উদাসীনতা আমি সহ্য করিতে পারি না।—কি দেখিলে সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া যাইতে পারি? এই কয়েকরাত্রি যে কতবার চিন্তা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নির্জ্জন উদ্যানের নিকট গিয়া বসিয়াছি ও ভাবিয়াছি ও কাঁদিয়াছি, তাহার পরিণাম কি? কেবল মাত্র এক একবার দেখিয়া যদি প্রাণে বাঁচি, তাহাতে প্রভু বিমুখ কেন? তাহাতে দোষ কি?—

সাবিত্রী—মাননীয়া, পবিত্রা। সুন্দর উদাহরণ। সাবিত্রী সম্বন্ধে আপনার দেব-লেখনী হইতে যাহা নির্গত হইয়াছে, তাহা সত্য। স্বর্গীয়া সাবিত্রীর নিকট যাইতে পারিব কি? পারিব না কেন? একজনের গুণ অবস্থা বশত ফুটিয়াছিল, লোকে দেখিতে পাইয়াছিল, আর একজনের গুণ ঘটনা বশত লোকের চোখের উপর ফুটিতে পাইল না। আমার সহিত সাবিত্রীর তুলনা সংসারের লোকের নিকট উপহাসের কথা হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, যিনি সকলই দেখিতেছেন, তিনি জানেন আর আপনিও জানেন, আমি কি। আর কিছু এখন লিখিতে পারিতেছি না, আমার প্রার্থনা, আমার হৃদয়ের অবোধ ব্যাকুলতা আপনার কোন অমঙ্গলের কারণ না হয়।"

শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী।

প্রেম কোথায় ?

১

হে প্রেম পরশমণি, হৃদয়ের ধন,
কোথা এবে হলে অন্তর্দ্ধান ?
না হেরি তোমার মুখ, বিষাদে বিদরে বুক,
তোমার অভাবে হায় ! আঁধার ভুবন,
জনপদ শ্মশান সমান ।

২

শৈশবের প্রণয় বিলাস
বাল্য সখা সনে সহবাস,
আমোদ আহ্লাদে হাসি, নব অনুরাগ রাশি,
আহার বিহার নৃত্য গীত রসোল্লাস ;—
স্মরণ হইলে সেই সুখের সময় আহা,
হৃদিসরোবরে উঠে প্রেমের উচ্ছ্বাস,
প্রাণের ভিতরে বহে প্রেমের বাতাস।

৩

প্রথম যৌবন কালে দেখিয়াছি তারে
আমি যেখানে সেখানে ;
সহজেই অবিচারে, মন খুলে একবারে
ঢালিয়া দিতাম ভালবাসা যারে তারে ;
ছিলনা সংশয় কিছু প্রাণে।

৪

না হইতে পরিচয় ধরিতাম গলে,
ঝরিত প্রণয় সুধা নয়নের জলে ;
ভাবিতাম সব ভাই,
পর আর কেহ নাই,
ভাসিতাম যেন সদা প্রেমসিন্ধু জলে,
দেখিতাম প্রেম-চক্ষে মানব সকলে ।

৫

কাল ধর্ম্মে এবে দিন দিন
বয়স বাড়িছে যত, ভূষণ্ডী কাকের মত
দেখে শুনে হইতেছি ততই প্রবীণ,
মনে হয় যেন এই বিশ্ব প্রেমহীন ।

৬

সুখের পৃথিবী কেন হল পুরাতন রে,
প্রেমশূন্য স্বার্থের আবাস ;
কুটিল সভ্যতাচার, অসরল ব্যবহার
সহেনা যে প্রাণে আর কি করি এখন রে,
লোকালয় যেন বনবাস !

৭

নর-হৃদি শূন্য করি হায় !
প্রেম তুমি লুকালে কোথায় ?
বাহিরে না অভ্যন্তরে, এ লোকে না লোকা-
ন্তরে,
কোথায় বিরাজ তুমি বলহে আমায় ?
হয়ে তব চিরদাস রহিব তথায় ।

৮

অঞ্জন হইয়া তুমি থ'ক মোর নয়নে,
সেই চক্ষে দেখি ধরাধামে ;
প্রেমানন্দরসে ভাসি, সদানন্দে হাসি হাসি,
ভালবাসি সবে এই সাধ বড় জীবনে ;
করি প্রেম দান অবিরাম ।

৯

প্রেম বিনা এ সংসারে, আর কিছু দেখি
নারে,
তাই তার লাগি প্রাণ কাঁদে দিন যামিনী ;
প্রেমিকের মিষ্ট বাণী, হাসি হাসি মুখ খানি,
নিবিড় নীরদ কোলে জলে যেন দামিনী ।

১০

প্রেমময় ভগবান প্রেমেতেই বর্ত্তমান,
প্রেম বিনা এ জীবনে কিবা সুখ আছে ভাই,
ভেবে দেখ মনে ;
এস ভবে প্রেমে গলে, হরি হরি হরি বলে,
হরি প্রেমরসে মজে ভালবেসে মরে যাই
হরির চরণে ।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা ।

ভবভূতি।

বীরচরিত—পরশুরাম।

বীরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য অতি গম্ভীর ভীষণ, অতি প্রবল কর্কশ। ইহার নায়ক রামচন্দ্র এবং প্রতিনায়ক ভগবান জামদগ্ন্য। এক দিকে যেমনই বিনয় এবং সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা, অন্যদিকে তেমনই গর্ব্ব এবং প্রগল্‌ভতার প্রাধান্য। এক দিকে করুণা এবং কোমলতা, অন্য দিকে নিষ্ঠুরতা এবং কাঠিন্য। এই পরস্পর-বিরোধী গুণ নিচয়ের সংস্পর্শে, নায়ক এবং প্রতিনায়কের চরিত্রের স্বতন্ত্রতা, অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হরশরাসন ভঙ্গের পর, রাম ও সীতার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; ভগবান জামদগ্ন্য, মাল্যবান ও শূর্পনখার নিকট এই সংবাদ শুনিয়া, মিথিলায় আগমন করিয়াছেন। রামচন্দ্র তাঁহার নিকট অতি গুরুতর অপরাধে অপরাধী; সে অপরাধের প্রতিবিধান আবশ্যক। কিন্তু তাঁহার নিকট রামচন্দ্রের অপরাধ,কেবলই হরকার্ম্মুক ভঙ্গরূপ গুরুতর অপমান জনিত নয়; তাহার অভ্যন্তরে আরও একটা গূঢ় কারণ নিহিত আছে। হর ধনুর্ভঙ্গ) সীতা বিবাহের পণরূপে জগতের বীরগণের বীরত্বের পরীক্ষাস্থল। জগতের মহা মহা বীরপুরুষগণ, সে পরীক্ষায় পরাভূত হইয়া গিয়াছেন; যিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, তিনি যে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বীর বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। রামচন্দ্র আজি সে বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি আজি বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয়। দিগ্বিজয় না করিলেও, আজ জগৎ বুঝিয়াছে যে, তিনি অদ্বিতীয় বীর, সংসারে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্লভ। পরশুরামের নিকট, রামচন্দ্রের এরূপ প্রতিপত্তি অসহনীয়. তিনি জানিতেন যে, সংসারে তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেহ নাই; বীর পুরুষের নাম করিতে হইলে, লোকে অগ্রে তাঁহারই নাম করিত। কিন্তু আজ অকস্মাৎ এ প্রতিদ্বন্দ্বী কোথা হইতে আসিল? তুচ্ছ ক্ষত্রিয় শিশু, যাহার পিতৃপিতামহগণের রুধিরে তিনি একবিংশতিবার আপনার পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিয়াছেন, সেই আজ তাঁহার সম্মুখে প্রতিযোদ্ধারূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে; নির্ব্বাণোন্মুখ শিখা আবার প্রজ্জলিত হইয়া, জগৎ আলোকিত করিয়াছে, ইহাত উপেক্ষা করিবার কথা নয়। জগতে এককালে এবং একই আকাশে, শত সহস্র নক্ষত্র সমুদিত হইতে পারে; কিন্তু আকাশমণ্ডল অনন্ত হইলেও, সেখানেত একটার অধিক সূর্য্যের স্থান হইতে পারে না; তবে পরশুরাম কেমন করিয়া, অবিবাদে রামচন্দ্রের প্রভাব দর্শন করিবেন? অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, প্রদীপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ করা কর্ত্তব্য। সেই জন্যই তিনি মাল্যবান ও শূর্পনখার নিকট, হরধনুর্ভঙ্গের সংবাদ পাইয়া,মিথিলানগরে আগমন করিয়াছেন। স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা বশত এবং হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বেগে, তিনি রাজাবরোধের সম্মান রক্ষা না করিয়াই, একেবারে কন্যান্তঃপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার রোষোদ্দীপক

মূর্ত্তি দেখিয়া, দ্বারপালগণ সভয়ে দ্বার ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। তিনি গম্ভীর স্বরে পরিচারকগণকে রামচন্দ্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বর্ষাজলপূর্ণমেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সীতা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ ভীতা হইয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্র উদ্বেগশূন্য; পরশুরামের বিক্রম এবং অমর্ষস্বভাব, তিনি যে অবগত ছিলেন না, তাহা নয়; কিন্তু নিরুদ্বেগই তাঁহার প্রকৃতি। তিনি ভাবিতেছিলেন যে, যিনি ভগবান ত্রিপুর দাহনকারী দেবাদিদেবের প্রিয় শিষ্য, যাঁহার পবিত্র চরিত্র বেদপাঠে পরিপূত, তিনি যে আজ অযাচিত হইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাহাত আনন্দেরই কথা, গৌরবেরই কথা, তবে তাহাতে উদ্বেগের বিষয় কি? তাঁহার হৃদয়ে যে কেবলই উদ্বেগ নাই তাহা নয়, কিন্তু তিনি পরশুরামের গুণেরও পক্ষপাতী; তিনি সীতা ও তাঁহার সখিগণের নিকট মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণগ্রামের প্রশংসা করিতেছিলেন। সে প্রশংসায় অসূয়া নাই, ঈর্ষাকটাক্ষপাত নাই, কেবলই গুণবিমুগ্ধ সরল হৃদয়ের ভাব। পরশুরাম যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য অবরোধ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এ কথা তিনি তখনও পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, জামদগ্ন্য কন্যান্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন, 'নন্বেতএব শিষ্টাচার পদ্ধতেঃ প্রণেতারঃ। তৎ কথময়ং বিদ্বান্ প্রমাদ্যতি? ভবতু উপসর্পামি", 'ইঁহারাইত শিষ্টাচারের পথ প্রদর্শক, তবে ইনি আজ জানিয়া শুনিয়াই এমন ব্যবহার করিলেন কেন?" যাহাই হউক, আমি নিকটে যাই, এই বলিয়া তিনি বাহিরে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। সীতা দেখিলেন, বড় বিপদ, "সকল ক্ষত্রিয় মহারাক্ষস" পরশুরাম আজি তাঁহার প্রাণের অধিক ধনকে বলি দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে; যাঁহার কঠোর করালে, হয়ত তাঁহার পিতৃ পিতামহগণের অনেকে চর্ব্বিত হইয়াছেন, আজ আবার তিনি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ধনকে আকর্ষণ করিতেছেন; এখন ত আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই। তিনি প্রিয়তমকে পরশুরামের নিকট গমন করিতে নিবারণ করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন মুগ্ধা বালিকা বড় কাতর হইয়া, প্রিয়তমের ধনু আকর্ষণ করিয়া বলিল, "অজ্জাউত্তণদাব তুহেমহিংগস্তব্বং জাবতাদো নাগচ্ছদি" "আর্য্যপুত্র, তবে একটু দাঁড়াও, বাবা আসুন, তবে যাইও।" আমরা বলিয়াছিলাম যে, ভবভূতির প্রতিভা গুণে আমরা বিমুগ্ধ; সীতার এই কয়টী কথা, ভবভূতির সেই অলৌকিক প্রতিভার অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। সরলা বালিকা পর্য্যাকুল হৃদয়ে বলিতেছিল—"তবে একটু দাঁড়াও বাবা আসুন, তবে যাইও।" এমন সরল ভাষায় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে, বাস্তবিকই মহাকবির শক্তির প্রয়োজন। হরকার্ম্মুক ভঙ্গ করিয়া, রামচন্দ্র জগতে আপনার অতুল্যবীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, যিনি জগতের বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়, জনকরাজ ত বীরত্বে তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। কিন্তু সরলা সীতা হৃদয়ের উৎকণ্ঠায় তখন প্রিয়তমের সেই অনুপম বীরত্বের কথা

বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বাল্যাবধি পিতার উপর নির্ভর করিতেই তাঁহার অভ্যাস হইয়াছিল, স্বামীনির্ভরতা তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার শিক্ষা হয় নাই। তিনি সেই জন্যই আপনার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি অনুসারে বলিতেছিলেন 'বাবা আসুন তবে যাইও।' এই অন্য-নির্ভরতা মনুষ্যের হৃদয়ে স্বতন্ত্রতা অপেক্ষাও বলবতী। শিশু পিতার নিকট তিরস্কৃত হইলে, পিতাকে তর্জ্জনী সঙ্কেতে শাসাইয়া বলে "আচ্ছা মার সঙ্গে বলে দেব এখন।" মাতার উপর নির্ভরই শিশুর ধর্ম্ম; সীতাও সেই জন্য রামচন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছিলেন, "বাবা আসুন তবে যাইও।"

রামচন্দ্র সীতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য বলিলেন। কিন্তু বালিকার হৃদয়ে,সে সান্ত্বনা বাক্য স্থান পাইল না। সীতা প্রিয়তমের ধনুক আকর্ষণ করিয়া রাখিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন— "তবে আমি ধনু রাখিয়াই যাই।" উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়া সীতা "তবে আমি তোমাকে যাইতে দিব না" বলিয়া, প্রিয়তমকে বল পূর্ব্বক নিবারণ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। সখিরা তাঁহার ভাব দেখিয়া একটু হাসিল, কিন্তু সীতার তখন লজ্জা করিবার সময় ছিলনা। দূর হইতে জামদগ্ন্যকে আগমন করিতে দেখিয়া, তিনি করপুটে বলিলেন, "আর্য্য পুত্র, আমাকে রক্ষা করুন, আপনি বড় অসম সাহসী, আমাকে রক্ষা করুন।" রামচন্দ্র পত্নীর কাতর ভাব দেখিয়া, একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন; কোথায় ক্ষত্রিয়বালিকার ন্যায় সীতা তাঁহার সহায়তা করিবেন, না বিপদপাতের পূর্ব্বেই তিনি কাঁদিয়া অধীরা। তিনি পত্নীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেনঃ—

মুনিরয়মথ বীর স্তাদৃশস্তৎ প্রিয়ংমে
বিরমতু পরিকম্পঃ কাতরে ক্ষত্রিয়াসি।
জগতি বিততকীর্ত্তে দর্প কণ্ডুল দোষ্ণঃ
পরিসরণসমর্থো রাঘবঃ ক্ষত্রিয়োঽহম্ ॥

এই আশ্বাস বাক্যে সীতার প্রতি একটু মধুর ভৎসনাও আছে। "একি সীতে, আজ তুমি এমন কাতরা হইতেছ কেন? তুমি ক্ষত্রিয় পত্নী, এ ভীতি কখন তোমায় ভাল দেখায় না; তুমি কি জাননা যে,আমি ক্ষত্রিয়, রঘুবংশে আমার জন্ম।" এ ভৎসনা রামেরই উপযুক্ত। যিনি ত্রিভুবনবিজয়ী দশাননের হন্তা, জামদগ্ন্যের সমক্ষে এই গর্ব্বমাত্র শূন্য মধুর ভৎসনা, তাঁহারই উপযুক্ত। রাম ও সীতার এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, পরশুরাম এমন সময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পরশুরামের চরিত্র সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী কথা না বলিয়া রাখিলে,আমাদিগের এ প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ থাকিবে। আমরা বলিয়াছি যে, ভবভূতি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিলেও, সকল সময়ে বাল্মিকীর অনুসরণ করেন নাই। প্রয়োজন মত নিজেরও প্রতিভার বিকাশের চেষ্টা করিয়াছেন; বীরচরিতে এই পরশুরামের চিত্র সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার নিজের সৃষ্টি।

বীরচরিতের পরশুরামে এবং রামায়ণবর্ণিত পরশুরামে কেবলই কার্য্যগত পার্থক্য নয়, চরিত্রগত ও বিভিন্নতা আছে। রামায়ণের পরশুরামে কেবলই তেজস্বীতা এবং কোপন স্বভাব; কিন্তু বীরচরিতের পরশুরামে তেজস্বীতা এবং কোপন স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাভিমান ও উদ্ধতভাব বড় প্রবল। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাতে

করুণা ও কোমলতারও অভাব নাই। তিনি বাহুবলে ও তপঃ প্রভাবে জগতের সকল ব্যক্তিকেই অবজ্ঞা করেন। জগতে তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি কেহ আছেন, অথবা থাকিতে পারেন, একথা তাঁহার নিকট অসহ্য। রামায়ণের পরশুরাম স্বয়ং মহাবীর হইলেও বুঝিয়াছিলেন যে, যিনি হর-শরাসন ভঙ্গ করিয়াছেন, তিনি স্বল্পবয়ঃ হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তি নহেন। কিন্তু বীরচরিতের পরশুরাম, রামচন্দ্রকে অহঙ্কারে একটী সামান্য বালক বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। আমরা রামায়ণ ও বীরচরিত, এই উভয় গ্রন্থ হইতেই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, আমাদিগের কথা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিব। আমরা বলিয়াছি যে, রামায়ণের পরশুরাম, রামচন্দ্রকে সামান্য বালক বলিয়া, অবজ্ঞা করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্রকে তিনি যে সকল কথায় সম্বোধন করিয়াছেন, তাহার ভাষা বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর হইলেও, তাহার প্রতি বর্ণে রামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকটিত। হর-শরাসন ভঙ্গরূপ যে অলৌকিক কার্য্যে রামচন্দ্র জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, পরশুরামও তজ্জন্য বিস্মিত, কিন্তু বিস্মিত বলিয়া রামচন্দ্রের প্রতি আস্থাশূন্য নহেন। শত্রু হইলেও তাঁহার প্রতি কেমন সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক; বয়কনিষ্ঠেরও সদ্গুণের কেমন আদর করা কর্ত্তব্য, এ সকলই যেন তাঁহার সম্বোধন বাক্যে বর্ত্তমান। কিন্তু বীরচরিতের পরশুরামে কেবলই পরুষভাব, কেবলই আত্মাভিমান। ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

পুষ্পময়ী।

(পুষ্পময়ী নাম্নী কোন খ্রীষ্টান বালিকার মৃত্যুতে তাহার জননী)

কোথা যাস্ পুষ্পময়ি ? আয় মা আমার !
যাস্‌নে যাস্‌নে ছেড়ে
দুখিনীর আছে কেরে ?
ভুলিলি কি ভালবাসা কাঙ্গালিনী মার ?
কোথা যাস্ পুষ্পময়ি ? আয় মা আমার !

১

হৃদয়ের বৃন্ত শূন্য করিয়ে কোথায়—
মায়েরে না ব'লে ক'য়ে
পাষাণের মত হয়ে,
কোমল কুসুম পুষ্প !—হায় ! হায় ! হায় !
করিয়ে হৃদয় শূন্য যাস রে কোথায় ?

২

যাস্‌নে যাস্‌নে, ফিরে আয় মা আমার,
আজ রে প্রাণের 'পুষি'
করিস্ যা তোর খুসি ;
এত যে বারণ তোরে করি বার বার ?
আগে ত অবাধ্য তুই ছিলি না আমার !

৩

অই যে সেজেছে মেঘ দেখ্ 'পুষি' চেয়ে,
হিম জল লেগে গায়,
কফ্ কাসী হবে তায়,
যাস্‌নে বাহিরে তুই দুখিনীর মেয়ে !
অই যে সেজেছে মেঘ দেখ্ 'পুষি' চেয়ে !

৪

অই দেখ্ মেঘে মেঘে বিজলী খেলায়,
এখনি পড়িবে বাজ,
বড়ই দুর্য্যোগ আজ,
দেখ্ দেখি ছেলে পিলে কে বাহিরে যায় ?
ডর পাবি পুষ্পময়ি ! আয় কোলে আয় !

৫

যাস্‌নে সেখানে তুই, আয় মা আমার,
তোর আরো আট ভাই,

গেছে সে বিষম ঠাঁই,
কেহই ফিরিয়ে তারা আসিল না আর,
তাই তোরে যেতে 'পুষি' দিব না এবার !

৬

সেখানে মানুষ গেলে ভুলে যায় সব,
কি জানি সে মাঠে আছে,
যাহারা সেখানে গেছে,
কিছুই থাকে না মনে আত্মীয় বান্ধব,
কি আছে সে শূন্যমাঠে, ভোলে যে মানব ?

৭

শুনেছি সেখানে নাকি ঘর বাড়ী নাই,
শুনেছি সে শূন্য মাঠে
দিনে যেতে প্রাণ ফাটে,
বড়ই নির্জ্জন সেই সমাধির ঠাঁই,
যাস্‌নেরে সন্ধ্যাকালে—একা যেতে নাই !

৮

কি ক'রে কফিনে তুই থাকিবিরে শু'য়ে ?
উপরে বাহিরে ঝড়,
শিলা বৃষ্টি বহুতর,
একাকী কফিনে তোরে আসিবেরে থু'য়ে,
কি করিয়া শূন্য মাঠে থাকিবিরে শু'য়ে !

৯

একিরে সত্যই 'পুষি' ছাড়িয়া চলিলি ?
করুণা মমতা যত,
সকলি স্বপ্নের মত,
কেমন পাষাণ প্রাণে মায়েরে ভুলিলি ?
কি করিয়া দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিলি ?

১০

রাখ গো কফিন তুলে দেখি একবার,
দেখি এই জন্ম শেষ,
মায়ের সুন্দর বেশ,
দেখি অই পুষ্পময়ি, বালিকা আমার !
দেখি আজ জন্ম শেষ—দেখিব না আর !

১১

এই যে রয়েছে পুষ্প মুদিয়া নয়ন,
পূর্ণিমার শশধর,
যেন কাল জলধর,
চুরি করি রাখিয়াছে করি আচ্ছাদন !
এই যে কফিনে পুষ্প মুদিয়া নয়ন !

১২

পুষ্পময়ি ! মা আমার ! নয়ন মেলিয়া,
দেখ এক বার চেয়ে,
দেখ রে পাষাণী মেয়ে,
বুকের পাষাণ খানি সরাইয়া দিয়া,
দেখ তোর অভাগিনী মায়েরে চাহিয়া !

১৩

হায়, হায় ! সহেনারে কি বলিব আর,
স্মরিতে ফাটেরে হিয়া,
বুঝাইব কি যে দিয়া,
'মা' বলে মায়েরে 'পুষি' ডাক একবার,
হয়ে নব পুত্রবতী,
হায় বিধি এদুর্গতি,
লিখেছিল কি যে পাপে কপালে আমার !
মা-ডাকের কাঙ্গালিনী হইনু এবার !

১৪

থাকিবিনা যদি 'পুষি' যা তবে সেখানে,
যা তবে সেখানে তুই,
কথা শুনে গেটা দুই,
বলিবি যাইরা তোর ভাইয়েদের সনে,
"মা দিছে পাঠায়ে ভাই
চল সবে চল যাই,
তোমাদেরে নিয়ে যাব মায়ের সেখানে !
যারে ব'লে চ'লে এ'লে,
আর না ফিরিয়ে গেলে,
দুখিনী জননী তাই কেঁদে মরে প্রাণে !
মা দিছে পাঠায়ে চল মায়ের সেখানে।"

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

পঞ্চনদ বৈদিক যজ্ঞে পরিপূরিত, সাম রবে প্রতিধ্বনিত, আর্য্য ইতিহাসের প্রমোদ কানন। একে ইহা আর্য্য সমাজের যৌবন কাল, তাহে ভারতে আর্য্যসন্তান বিজয়ী, নিত্যই বলিদান, নিত্যই যজ্ঞ, নিত্যই হোম নিমন্ত্রণ, কলরব, প্রমোদ বাসর। যজ্ঞের পর নূতন যজ্ঞ নিত্য উদ্ভাবিত ; অনার্য্য প্রজা যত পেষিত, ভীত, আর্য্য সন্তান ততই প্রফুল্ল, উৎসাহিত। এ ধর্ম্ম যৌবনের ধর্ম্ম, বিজয়ীর ধর্ম্ম, মোহের ধর্ম্ম, বাহিরের ধর্ম্ম। ইহা কর্ম্ম কাণ্ড প্রধান। এ সময় আর্য্যসন্তান বাহ্য প্রকৃতি চালিত, বাহ্য প্রকৃতি মুগ্ধ। বাহ্য প্রকৃতি চিন্তাশূন্য, এ ধর্ম্ম চিন্তাশূন্য। বাহ্য প্রকৃতি বিজয়ীর সহায়, আর্য্য সন্তান তাহার সেবা করেন, আরাধনা করেন, গৌরব করেন। বাহ্য প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়ের অধিকারিণী। বৈদিক ধর্ম্ম বাহ্য প্রকৃতির পদানত।

অনার্য্য পীড়িত প্রজা বাহ্য প্রকৃতি প্রপীড়িত। প্রকৃতার তিনি অধিকারী নহেন, ভীষণতার অভিসম্পাতের তাড়নার পাত্র। অনার্য্য সন্তান বাহ্য প্রকৃতির নিকট চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, ইন্দ্রিয় নিবৃত্ত করিলেন। বাহ্য প্রকৃতি পরাস্ত হইল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি অন্তঃপ্রকৃতির বিশালতর রাজ্যের সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইলেন, তিনি যাহা দেখিলেন বাহিরে তাহার তুলনা নাই, বাহ্য প্রকৃতি উপেক্ষিত হইল, অন্তঃপ্রকৃতি গৌরবান্বিত হইল। চিন্তার কঠোর সৌন্দর্য্য, পার্ব্বতীয় ভয়-জড়িত মধুরতা, ভাবের কুসুম কোমল, বায়ু পেষিত, আতপ সন্তাপিত প্রাণশূন্য নারী সৌন্দর্য্য পরাস্ত করিল। আবার পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই পুরুষত্ব-প্রধান, পরাস্ত প্রবৃত্তি বীর ধর্ম্মের নাম যোগ ধর্ম্ম। প্রকৃতি চপলা, ভীরু, প্রমদা, মানিনী ও কোপনা, পুরুষ অটল, সাহসী, বিরত ও নিবৃত্তি-পরায়ণ। প্রকৃতির বিড়ম্বনা অসহ্য হইলে লোকে পুরুষার্থের মহত্ত্ব অনুভব করে। ভগবান পাতঞ্জলি এই পুরুষকারের প্রচারক। কপিলদেব প্রকৃতির দাস, পাতঞ্জলি পুরুষ সহচর, সাঙ্খ্যসূত্রে প্রকৃতি প্রধান, পাতঞ্জলি প্রকৃতি পুরুষের সমতা বিধান করেন, শাক্য সিংহের প্রকৃতি পুরুষ সমক্ষে ব্রীড়াবতী, মুদিত চক্ষু গুণ্ঠন হস্তা। সাঙ্খ্যসূত্র যোগসূত্রের পূর্ব্বতন। এই যোগ সূত্র আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের অগ্রগামী। পণ্ডিত-প্রবর শাক্যসিংহ পাতঞ্জলির শিষ্য, অনার্য্যগণের অগ্রণী, ভারতে পুরুষ ধর্ম্মের প্রচারক। শঙ্করাচার্য্য, শাক্য শিষ্য, বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিপ্লবের ধর্ম্ম, অনার্য্যের ধর্ম্ম, পুরুষের ধর্ম্ম, চিন্তার ধর্ম্ম। ভাব, কল্পনা, কবিত্ব, কোমলতা বৌদ্ধধর্ম্মে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম উপনিবেশিকের ধর্ম্ম নহে, অনৈতিহাসিকের ধর্ম্ম নহে, ক্ষণপ্রাণ ধর্ম্ম নহে ; ভারত ইতিহাসের ক্রম বিকাশে আর্য্য অনার্য্য প্রকৃতির সংমিশ্রণে, যৌবনের পরিণামে, চিন্তাশীল পরিপক্কতার অভ্যুদয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি। বৈদিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-পরায়ণ, বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিবৃত্তিপরায়ণ। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি শ্মশান বৈরাগ্যের পূর্ব্ব সোপান। পক্ষান্তরে যাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম শঙ্কর বা কুমারিল বা অন্য কাহা কর্ত্তৃক ভারত নির্ব্বাসিত বা মৃত ধর্ম্ম বলিয়া অনুমান করেন, তাঁহারা শাস্ত্রে অপণ্ডিত। যাহা হইতে পারে তাহা থাকিতে পারে, যাহা হয় তাহা যায় না, যাহা ছিল তাহা আছে, বিবর্ত্তবাদের এই মহা সূত্র তাহা-

দিগের অপরিজ্ঞাত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখনও ভারত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বৈদিক ধর্ম্ম যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল; কর্ম্মমার্গ যেমন জ্ঞানমার্গে পৌঁছিয়াছিল, তেমনি বৌদ্ধধর্ম্মও বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। বিবর্ত্তবাদের মূল-সূত্র এই, ভারত ইতিহাসের সাক্ষ্যও এই। বৈদিক ধর্ম্ম, যজ্ঞ, হোম, আনন্দের ধর্ম্ম; যোগধর্ম্ম ধ্যান ধারণা সমাধি বিষাদের মূল ধর্ম্ম। বৈদিক ধর্ম্মে একমাত্র কর্ত্তব্য যজ্ঞ-সাধন, বৌদ্ধধর্ম্মে একমাত্র কর্ত্তব্য চিত্ত-শুদ্ধি। বৈদিক ধর্ম্মে দুইটী আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য, যোগ ধর্ম্মে সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থের বিধান হয়। বৈদিক ধর্ম্মে জাতিকাল স্থানও পাত্র ও অবস্থানুসারে কৃচ্ছ্র সাধনীয়, যোগ ধর্ম্মানুসারে অহিংসা সত্য অথেয় ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বজন সেবিতব্য। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম উভয়ের সমন্বয় করিয়াছে। ইহাতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমপ্রভাব। ভগবৎগীতা এই ধর্ম্মের শাস্ত্র। গীতাকার শাক্য সিংহের উত্তর পুরুষ।

কাল তোমার যৌবনের কবিত্ব উৎসাহ দেখিয়াছি আজি তুমি চিন্তাকাতর, বিষাদ-জড়িত, চিন্তিত নয়ন। একদিন তোমার উন্মামতা, অন্যদিনে তোমার শ্রান্তি, ইহা প্রকৃতি-সিদ্ধ। আজ চিন্তা শুষ্ক কঠোরতা দেখিয়া কে অস্বীকার করিবে, তুমি কালিকার হাস্যময় সেজন নহ? তুমি সেই তুমি, সময়ে প্রকৃতি অঙ্কুরকে লতায়, লতাকে ফলরূপে পরিণত করে। সময়ে প্রকৃতি তোমার ভাবকে অপসারিত করিয়া চিন্তাকে স্থান দিয়াছে। সময়ে প্রকৃতি ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছিল। সময়ে প্রকৃতি বৈদিক ধর্ম্মকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিবর্ত্তিত করিয়াছিল। একটী অপরটীর অবশ্যম্ভাবী ফল। অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খলের বন্ধনী, সেই শৃঙ্খলের তৃতীয় বন্ধনী বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম, চতুর্থ বন্ধনী তৃতীয়ের পরস্থল হইবে। তাহা ঘটিবে ইহা যেমন নিশ্চয়, তাহা তৃতীয়ের পরিণামফল ইহাও তেমনি নিশ্চয়। "পুনর্জ্জীবন" "পুনরুদ্ধার" ইত্যাদি মোহের স্বপ্ন। নবজীবন, নবজীবনও বটে; পুরাতনও বটে; ঠিক পুরাতন নহে, ঠিক নূতনও নহে। যখন সে সন্তান জন্মিবে, বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিবে, তাহার প্রকৃতিতে মাতৃ প্রকৃতি লক্ষিত হইবে, সে মায়ের কন্যা, মায়ের মা মাতামহী নহে। হিন্দুধর্ম্মের "পুনরুদ্ধার" বাতুলের প্রলাপ। জাহ্নবী প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া হিমালয় কূটস্থ করা যেমন সম্ভব, বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার তেমনি সম্ভব। ক্রম বিকাশে কোথায় একটীর আরম্ভ অপরটীর অন্ত, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বৈদিক ধর্ম্ম উপেক্ষা করিলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বুঝা যেমন দুষ্কর, কখন বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝা তেমনি দুষ্কর। যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী গুলি পর্ব্বতে ঝির ঝির করিতেছিল, শাক্য সিংহ তাহাদিগকে একত্র করিয়া একটী মহানদীতে পরিণত করিয়াছিলেন মাত্র। বস্তুত খ্রীষ্টের পূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্মের ও শাক্যের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছিল। তেমনি আবার কখন কাহা কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্ম বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, বলা যায় না। আবার নিত্য যে সহস্র প্রকার ঘটনা ঘটিতেছে, কোনটী উপলক্ষ করিয়া দুর্লক্ষ্য সূত্রে কত দিনে কি নূতন মহাধর্ম্মের উৎপত্তির সূচনা হইতেছে, কে বলিতে পারে?

* বৈদিক ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম অপেক্ষা এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট, এখানে তাহার কিছুই আলোচনা করা হইল না। ক্রমোন্নতির ন্যায় ক্রমাবনতি বিবর্ত্তন নিয়ম। সুতরাং সময়ে পরস্তন হইলেই যে গুণে উন্নততর হইবে, এমন আশা করা যায় না। অন্যান্য প্রকৃতির ন্যায় ধর্ম্ম প্রকৃতি ক্রম বিকাশ সিদ্ধ, কাল পাত্র ও অবস্থা সাপেক্ষ, কেহই সম্পূর্ণ নূতন বা বিচ্ছিন্ন নহে, সকলের সহিত সকলের সংযোগ আছে; ইহাই মাত্র আলোচনা করা হইল। স্থানভেদে ধর্ম্মভেদ হইবেই হইবে। কালভেদে ধর্ম্মভেদ হইবেই হইবে। য়ুরোপের ধর্ম্ম আসিয়ার ধর্ম্ম হইতে পারে না; কলিকাতা প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত ভবানীপুর প্রচলিত ধর্ম্মের পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে। তেমতি সত্যযুগের ধর্ম্মও দ্বাপরের ধর্ম্ম এক হইতে পারে না। পূর্ব্বের ধর্ম্ম পরে থাকেনা, পরের ধর্ম্মও পূর্ব্বে যাইতে পারে না। জগদ্ব্যাপী এক ধর্ম্ম, জগদ্ব্যাপী এক ভাষা, একাচার, একজাতি, এসব কবির কল্পনা মাত্র।

কোন এক বিষয়ে দুই জনে এক মত হইতে পারে না। প্রত্যেকের হাতে পাঁচ আঙ্গুল বটে, কিন্তু কাহারও একটী আঙ্গুল অন্যের আঙ্গুলের সমান নহে। একই বৃক্ষে একই শাখার একই পল্লবের দুইটী পত্র এক রূপ নহে। দেহের ন্যায় সকলেরই মন আছে সত্য, কিন্তু কোন দুই জনের মন একরূপ নহে। মনের কোন একটী বৃত্তি দুই জনের একরূপ নহে। তখন কোন এক বিষয়ে দুই জনের এক মত হয় না, ইহা আশ্চর্য্য নহে। একই শব্দ দুই জনে একরূপ শুনে না, একই অর্থ দুইজনে একরূপ বুঝেনা। যেখানে সাম্য প্রভৃতি অসম্ভব, সেখানে ঘটনার সম্ভাবনা কোথায়? শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

ভবভূতি।

বীরচরিত—পরশুরাম।

রামায়ণ ও বীরচরিত হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই, বোধ হয় সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, বাল্মীকির ও ভবভূতির পরশুরামের পার্থক্য কত সুস্পষ্ট।

"রাম! দাশরথে! বীর, বীর্য্যং তে শ্রূয়তেহদ্ভুতম্।
ধনুঃ কিলত্বয়া ভগ্নং দিব্যং সৎ তচ্ছ্রুতং ময়া॥
অদ্ভুতং তৎকৃতং রাম! ধনুষো ভেদনং ত্বয়া।
শ্রুত্বৈতদাহমনুপ্রাপ্ত আদায়েদং মহদ্ধনুঃ॥
অনেন ধনুষা রাম! ময়া কৃৎস্নামহীজিতা।
পূরয়েদমপিক্ষিপ্রং বলং দর্শয় রাঘব॥
তদহং তে বলং দৃষ্টা ধনুষোপাস্য পূরণে।
দ্বন্দযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্য্যশ্লাঘ্য মহমম্॥
... ...

ইমে দ্বে ধনুষীরাম! দিব্যে লোকাভিপূজিতে।
দৃঢ়ে বলবতী মুখ্যে সুকৃতে বিশ্ব কর্ম্মণা।
তয়োরেকং প্রযকায় দত্তং রাম! যুযুৎসবে।
ত্রিপুরং জঘ্নুস্ব দেবৈর্ভয়ং কাকুৎস্থয়ং ত্বয়া।
ইদং দ্বিতীয়ং দুর্দ্ধর্ষং বিষ্ণবে দদহুঃ সুরাঃ।
ত্রব্য সার বল প্রাণ প্রমাণাকৃতিভিঃ সমম॥
তদিদং বৈষ্ণবং রাম পিতৃ পৈতামহং মম।
ক্ষত্র ধর্ম্ম মুপাশ্রিত্য গৃহাণ ধনুরুত্তমম্।
যোজয়স্ব গৃহীত্বাচ শরেণ রঘু নন্দন।
যদি শক্তোহসি সংধাতুং যুদ্ধং দাস্যামিতে-ততঃ॥" রামায়ণ।

আমরা বলিয়াছি যে, রামায়ণের পরশুরামের বাক্যের প্রতি বর্ণেই, রামচন্দ্রের

প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকটিত। "বীর রামচন্দ্র, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা বড় অদ্ভুত। তোমার এই অদ্ভুত কার্য্য শুনিয়া, আমি আজ তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। দেখ রাম, আমার হাতে এই যে ধনু দেখিতে পাইতেছ, এই ধনুতে একবার আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলাম। যদি তুমি ইহাতে গুণ দিতে পার, তবেই আমি তোমার বল বুঝিব। এবং তাহা হইলেই জানিব যে,দ্বন্দযুদ্ধে তুমি আমার উপযুক্ত বট।"

এ কথায় অহঙ্কার নাই, উদ্ধতভাব নাই, অথচ তাহা অর্থ পূর্ণ এবং সাগর তরঙ্গের ন্যায় গম্ভীরনাদী। কিন্তু বীর চরিতের পরশুরামের কথাগুলি,কেবলই দাম্ভিকতার নিদর্শন। তিনি ভাবিতেছিলেন ;—

"অহো দুরাত্মনঃ ক্ষত্রিয় বটোরণাত্মজ্ঞতা।
ন এন্তং যদি নামভূতকরুণা সন্তান শান্তাত্মন
স্তেন ব্যাকৃজতা ধনুর্ভগবতো দেবাভবানী পতেঃ।
তৎপুত্রস্ত মদান্ধতারকবধাদ্বিশ্বস্ত দত্তোৎসবঃ
স্কন্দঃ স্কন্দইব প্রিয়োহমথবা শিষ্যঃ কথংন শ্রুতঃ॥"

"এই দুরাত্মা ক্ষত্রিয় বটুরত দেখিতে পাইতেছি, বড় অনাত্মজ্ঞতা। করুণাপরবশ বলিয়া, যদি মহাদেবের কথাই সে বিস্মৃত হইয়া থাকে, কিন্তু আমার কথা কি তাহার একবার মনে পড়িল না? না এ দোষ তাহার নয়; আমি যে এত দিন নিশ্চিন্ত ছিলাম, এদোষ আমারই।" বীরত্বের প্রশংসা দূরে থাকুক, প্রথমেই দুরাত্মা নামে সম্বোধন। আমরা সেই জন্যই বলিয়াছি যে, বীরচরিতের পরশুরাম, ভবভূতির নিজের সৃষ্টি এবং রামায়ণ হইতে সম্পূর্ণ রূপ বিভিন্ন।

কিন্তু ভবভূতির পরশুরাম, রামায়ণ হইতে বিভিন্ন হইলেও অতিরঞ্জিত অথবা কেবলই কল্পনা প্রসূত নয়। তিনি পরশুরামে আত্মাভিমানের সঙ্গে তেজ, ক্রোধন স্বভাবের সঙ্গে অনুকম্পার সমাবেশ করিলেও একরূপ সুন্দরভাবে তাহাদিগের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন যে, তাহার প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে আমরা প্রাকরণিক বিষয় হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, এইবার আমাদিগের প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব।

রামচন্দ্র ও জামদগ্ন্য পরস্পর পরস্পরকে সন্দর্শন করিলেন। পরস্পরের দর্পনিকষ ভুবনের দুই অদ্বিতীয় বীর, প্রতিদ্বন্দী ভাবে একত্রিত হইলেন। পরস্পরকে দেখিয়া, দুই জনের মনে দুইটী স্বতন্ত্র ভাবের উদয় হইল। এক জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি, অন্যের হৃদয়ে বিস্ময় এবং অনুরাগ; রামচন্দ্র ভাবিতে ছিলেনঃ—

"অকলিত তপস্তেজোবীর্য্য প্রথিম্নি যশোনিধা।
ববিতৃথমদাখাতে রোষাম্নুনাবভিধাবতি।
অভিনবধনুর্বিদ্যা দর্প ক্ষমায় চ কর্ম্মণে
স্ফুরতি রভসাৎ পাণিঃ পাদোপ সংগ্রহণায়॥"

জামদগ্ন্য ভাবিতেছিলেনঃ—

"সাধুরাজপুত্র! সাধু সত্য মৈক্ষাকঃ খলসি।
অথিষাতঃ প্রমথনায় মমাপি দর্পা—
দাত্মান মর্পয়সি জাতি বিশুদ্ধ সত্বঃ।
গন্ধদ্বিপেন্দ্র কলভঃ করিকুম্ভ কূট
কুট্টাকপাণি কুলিশস্ত যথা মৃগারেঃ॥"

কিন্তু অনুরাগ জামদগ্ন্যের প্রকৃতি নয়। রামচন্দ্রের সাহসের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার স্বাভাবিক অহমিকা আসিয়া, তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতেছিল। তিনি রামচন্দ্রের মোহিনী মূর্ত্তিতে বিমোহিত হইয়া বলিলেন ;

"রমণীয়ঃ ক্ষত্রিয়কুমারঃ আসীৎ।"

"চক্ষুৎপক্ষ শিখণ্ডমণ্ডলমসৌ মুগ্ধ প্রগল্‌ভশিশুঃ
গম্ভীরঞ্চ মনোহরঞ্চ সহজং শ্রীলক্ষরূপং দধৎ।
প্রাগদৃষ্টোহপি হরত্যয়ং মম মনঃ সৌন্দর্য্য
সারপ্রিয়া
হন্তব্যস্তু তথাপি নাম বিপক্ষো বীরব্রত
ক্রূরতাম্।"

পরশুরাম ভাবিতেছিলেন, রামচন্দ্রের মূর্ত্তি বড় কমনীয়; কিন্তু বীরব্রত বড়ই কর্কশ, এমন সুন্দর বালককেও বধ করিতে হইবে। যিনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, যাঁহার পরশু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনেরও অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিল, জগতে যাঁহার তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিলনা, তাঁহার হৃদয়ে যে স্বভাবত এইরূপ আত্মাভিমান এবং অবজ্ঞাপূর্ণচিন্তা আসিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? রামচন্দ্র যে তাঁহার বধ্য, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ মাত্রই ছিল না। কিন্তু রামচন্দ্রের চিত্তবৃত্তি অন্য প্রকার। পরশুরাম তাঁহার নিকট কেবলই প্রতিবন্দ্বী যোদ্ধা মাত্রনহেন, তিনি তাঁহার নিকট ইতিহাস অথবা পুরাণবর্ণিত মহাপুরুষ। বাল্যাবধিই যাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ এবং অদ্ভুত গুণ নিচয় তিনি আত্মীয়গণের মুখে এবং কবিগণের গাথায় শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই মহাপুরুষ আজি সশরীরে তাঁহার সমীপে উপস্থিত। বিস্ময়ে তাঁহার হৃদয় আপ্লবিত হইল। তিনি বিমুগ্ধনেত্রে পরশুরামের জটাকলাপকুটিল মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। সংসার জ্ঞান শূন্য শিশু, যেমন পতনোন্মুখ ব্যাঘ্রের সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া, তাহার দিকে চাহিয়া থাকে; নির্ভয়ে এবং নিরুদ্বেগে যেমন তাহার বিশাল দংষ্ট্রা এবং তীক্ষ্ণনখরের প্রশংসা করে, রামচন্দ্র তেমনই অস্থির চিত্তে পরশুরামের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া পরশুরাম কিছু বিস্মিত হইলেন। জগতে কেহ কখনও তেমন করিয়া তাঁহার দিকে চাহিতে সাহস করে নাই। তবে বালকের হৃদয়ে এ সাহস কোথা হইতে আসিল?

তিনি রামচন্দ্রের সাহস পরীক্ষা করিবার জন্য স্বীয় করস্থিত পরশু তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "রাম! দাশরথে সএবায় মাচার্য্য পাদানাং প্রিয়ঃ পরশুঃ" কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অপর কেহ হইলে হয়ত পরশুরামের সেই "ক্ষত্রিয় কালরাত্রি" পরশুর নাম শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইত। তাঁহার পরশুর নাম শুনিলে, কবে কোন ক্ষত্রিয় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কিন্তু রামচন্দ্র সকল অবস্থাতেই অটল। "উত্তাল তাড়কোৎপাত" দর্শনেও তিনি অকম্পিত; আজি পরশুরামের কুঠার দর্শনেও তাঁহার ধৈর্য্যের ব্যতিক্রম নাই। তিনি সেই দেবদত্ত কুঠারের এবং সঙ্গে সঙ্গে কুঠারধারীরও প্রশংসা করিলেন; সে প্রশংসা তোষামোদ নহে, প্রকৃত কথা মাত্র; অথচ তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভয় অথবা বিস্ময়ের নিদর্শন ছিল না। প্রশংসা-প্রিয় জামদগ্ন্য রামচন্দ্রের সেই মধুর কথায় বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তিনি একেবারে বিগলিত প্রায় হইয়াই বলিলেন, "রাম, তুমি আমার হৃদয়জ্ঞ, তোমাকে বুকে রাখিবার জন্য মনে মনে বড়ই সাধ হইতেছে।" যিনি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন; "রমণীয়ঃ ক্ষত্রিয় কুমারঃ আসীৎ" পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন,—

"রাম, সত্যৈব হৃদয়ঙ্গমোহসিমে

সত্যং ব্রবীমি পরিরব্ধু মিবেচ্ছতি ত্বাম্।"

বড় কৌতুকের কথা। কিন্তু জগতে যদি মধুর কথার সঙ্গে, মধুর হৃদয়ের যোগ থাকে, তবে তাহাতে বশীভূত না হয় কে? গ্লাডষ্টোন বল অথবা ব্রাইট বল, সকলেরই আধিপত্য মধুর হৃদয়ের সঙ্গে মধুর ভাষার যোগ আছে বলিয়া। যাহারা পেন্নলিকে হত্যা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারাই তাঁহার মধুর কথায় মোহিত হইয়া, তাঁহার পদানত হইল। তবে জামদগ্ন্য যে রামচন্দ্রের কথায় বিমুগ্ধ হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যাঁহারা আততায়ীভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বহুদিনের পরিচিত সুহৃদের ন্যায় বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কবির উদ্দেশ্য বুঝি ব্যর্থ হইল। অপর কেহ হইলে, এতদূর আসিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইত না। কিন্তু ভবভূতি অতিআশ্চর্য্যকৌশলে আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিয়া লইলেন। এবং পাঠকগণের সমক্ষে রামচন্দ্রের চরিত্র, আরও উজ্জ্বলতর বর্ণে প্রতিভাত হইল।

পরশুরাম রামচন্দ্রের গুণে বিমুগ্ধ হইলেও রামচন্দ্র অবিচলিত; পর্ব্বতের ন্যায় নিষ্কম্প। নিন্দা অথবা প্রশংসা, আলিঙ্গন অথবা প্রত্যাখ্যান, তাঁহার হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। তিনি পূর্ব্বে পরশুরামের গর্ব্বিত বাক্যে বিকম্পিত হন নাই; এক্ষণে তাঁহার সস্নেহ সম্ভাষণ শুনিয়া অতি বিনীতভাবে অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ভগবন্‌ঃ পরিরম্ভনমিতি প্রস্তুতপ্রতীপ মেতৎ" ভগবান্, আজ, আমরা যে কার্য্যে উদ্যত, আলিঙ্গন ত তাহার অনুকূল নয়।" রামচন্দ্রের উত্তরে পরশুরাম স্তম্ভিত হইলেন। ক্ষত্রিয়ের নিকট তিনি এমন কথার প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি ভাবিলেন, রাজন্য কুমারের কি দর্প-জড়িত মহান্ অহঙ্কার! অথবা বুঝি এ কেবলই সামান্য বালক নয়;—

"ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ
ক্ষাত্রোধর্ম্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোষস্য গুপ্ত্যৈ।
সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানাম্
আবির্ভূয় স্থিতইব জগৎপুণ্যনির্ম্মাণরাশিঃ॥"

তিনি মনে মনে রামচন্দ্রের সাহসের প্রশংসা করিলেন; কিন্তু কেবলই বাঙ্‌মাত্র সাহসে পরশুরাম পরিতৃপ্ত হইবার লোক নহেন। রামের যে মুখে এমন নির্ভীকতা, তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন; কিন্তু নববিবাহিতা সীতার সমক্ষে সে পরীক্ষা গ্রহণ অসম্ভব। এজন্য তিনি সীতার সখীগণকে বলিলেন "তোমরা এই নববধূটীকে অভ্যন্তরে লইয়া যাও।" রামচন্দ্রও ভাবিতেছিলেন যে তাহা হইলেই ভাল হয়। এমন সময় নেপথ্যে শব্দ হইল যে "রাজা জনক জামাতার বিপদ শুনিয়া ধনুষ্পাণি সেই দিকে আগমন করিতেছেন।" সরলা সীতা পিতার আগমন শুনিয়া নিশ্চিন্তা হইলেন, ভাবিলেন, তবে আর কি বিপদের বুঝি শেষ হইল। তিনি সমরলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া, সখীগণের সহিত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

আমরা বলিয়াছি যে, পরশুরাম কঠোরতা এবং নিষ্ঠুরতার আধার; কিন্তু তাহাতে করুণা ও কোমলতারও অসদ্ভাব নাই। রামচন্দ্রকে দেখিয়া, তাঁহার কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে। যে হৃদয় মাতৃশির চ্ছেদনেও কুণ্ঠিত হয় নাই, গর্ভস্থ শিশু সন্তানগণকেও খণ্ড খণ্ড করিতে পরাঙ্মুখ

হয় নাই, রামচন্দ্রের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া আজ তাহা বিগলিত হইয়াছে। কোন প্রাণে রামের এই কোমল শরীরে আঘাত করিব ভাবিয়া, তাঁহার চক্ষুতে জল আসিতেছিল। রাম তাঁহার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"তৎ কিমিতি অতি বাষ্পায়িতং ভবতা? আজ আপনাকে এমন ব্যাকুলিত দেখিতেছি কেন? পরশুরাম বলিলেন—"ন কিঞ্চিৎ" "না কিছুনয়।" "সন্তুষ্টৈব মুথানি চেতসি পরং ভূমান মাতম্বতে যথা লোক পথাব জারিণি রতিং প্রস্তৌতি নেত্রোৎ সবঃ।
স ত্বং নূতনএববন্ধনধরঃ শ্রীমান প্রিয়শ্চে তসো
হন্তব্যঃ পরিভূতবান্ গুরুমিতি প্রাগেব দূয়া মহে॥"

কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার নয়ন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল; তুমি নববিবাহিত, কিন্তু গুরুর অবমাননার প্রতিশোধের জন্ম তোমাকে যে বধ করিতে হইল, এই বড় ক্লেশ। রামচন্দ্র দেখিলেন যে, পরশুরাম তাঁহার প্রতি অনুকম্পাই প্রকাশ করিতেছেন। রামচন্দ্র বীর; বীরপুরুষের হৃদয় অনুকম্পার প্রার্থী নয়। তিনি আপনার স্বাভাবিক বিনয় পূর্ণ অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন "ভার্গব, জায়তে মামনুকম্পস ইতি।" ভার্গব, বুঝিলাম আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহই প্রকাশ করিতে চান্। পরশুরামের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে একথা বড় অসহ্য হইল। ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয় শিশুর মুখে শুনিতে হইল "ভার্গব"; আর্য্য ভগবন্, না শুনিয়া শুনিতে হইল ভার্গব। ক্রীড়াপর সিংহ যেমন কশাঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া, শাসকের দিকে অবিনয় কটাক্ষপাত করে, তিনি রামচন্দ্রের দিকে একবার তেমনই কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "ক্ষত্রিয় বটো, অতিনাম প্রগল্ভসে" আর নিস্তার নাই অস্ত্র গ্রহণ কর। জনক ও শতানন্দ উভয়েই ইতিপূর্ব্বে রামচন্দ্রের সহিত জামদগ্ন্যের বিবাদের কথা শুনিয়া সেখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রামচন্দ্রকে বলিলেন, "বৎস রামচন্দ্র বিস্রব্ধবংজাবদাস্ব। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, রামচন্দ্র অনিচ্ছাসত্বেও বিবাদে নিরস্ত হইলেন। জামদগ্ন্যও শতানন্দকে দেখিয়া, একটু লজ্জিতের ন্যায় বলিলেন, "অপিস্বস্থমাঙ্গিরসস্য? শতানন্দ বলিলেন "বিশেষতস্তদ্দর্শনাৎ"

এইরূপ পরস্পর অভিবাদন ও কুশল প্রশ্নের পর শতানন্দ জামদগ্ন্যকে বলিলেন, কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, আমাদিগের মর্য্যাদা ভঙ্গ করা আপনার ন্যায় ব্যক্তির কর্ত্তব্য হয় নাই। পরশুরাম একটু হাসিয়া বলিলেন, আমরা বনবাসী, রাজাধিরাজগণের কুলপদ্ধতিত আমরা অবগত নই। যিনি দিগ্বিজয়ে পৃথিবী জয় করিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি একজন সামন্তরাজকে রাজাধিরাজ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, বড়ই কৌতুকের কথা। পরশুরামের সোৎপ্রাস উক্তিতে রাজা জনক একটু ব্যথিত হইলেন। তিনি পরশুরামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনি আমাদিগের সমক্ষেই এই বালক রামচন্দ্রের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা করিতেছেন কেন? এই সময় কঞ্চুকী আসিয়া বলিল, মহারাজ, দেবীগণ কঙ্কন মোচনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, জামাতাকে অভ্যন্তরে প্রেরণ করুন। জনক ও শতানন্দ রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরে গমন করিতে বলিলেন। রামচন্দ্র গুরুজনের অনুমতি পাইয়া

জামদগ্ন্যের নিকট বলিলেন, "ভগবন্ জামদগ্ন্য, এব মাদিশস্থি গুরবঃ।" জামদগ্ন্য রামচন্দ্রের প্রার্থনায়, যে অনুমতি দিলেন তাহা তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপ। তিনি বলিলেন, ক্ষতি কি যাও লোকধর্ম্ম সম্পাদন কর, আত্মীয়গণ তোমাকে শেষ দেখা দেখিয়া লউন, কিন্তু যেন তোমার স্মরণ থাকে যে, অরণ্যবাসীগণ অধিকক্ষণ জনপদে বাস করেন না। এই সময় সুমন্ত্র আসিয়া নিবেদন করিল যে, বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে দেখিতে চাহিতেছেন। তখন রাম চন্দ্র গুরু জনের অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে এবং পরশুরাম প্রভৃতিও বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উদ্দেশে বহির্দ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

বীর চরিতের তৃতীয় অঙ্ক সম্পূর্ণরূপেই ভবভূতির নিজের সৃষ্টি। আমরা বলিয়াছি যে, বীর চরিতের পরশুরাম, আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ। ভবভূতি পরশুরামের চরিত্র এই তৃতীয় অঙ্কে অতি সুন্দর রূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের চরিত্রও পাঠকের নিকট অতি উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত করিয়াছেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরশুরামকে দেখিয়া বলিলেন, বৎস, এই শুষ্ক কলহ হইতে বিরত হও; সসাগরাপৃথিবীরঅধীশ্বর, ইন্দ্রের সখা রাজা দশরথ, আজ তোমার নিকট পুত্রের জীবনের জন্য অভয় প্রার্থী, ইহার প্রার্থনা পূর্ণ কর। কিন্তু জামদগ্ন্য তাঁহাদিগের বিনীত বাক্য শুনিয়া বলিলেন, আপনাদিগের নিকট আমার নিবেদন যে, একার্য্য আমার অসাধ্য। আমরা এই প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র পরশুরামের নিকট কেবলই গুরুর অবমাননাকারীমাত্র নহেন, তিনি তাঁহার দর্প নিকর প্রতিদ্বন্দ্বী। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া পরশুরাম বলিলেন, "রাম বালক হইলেও অতি অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছে, এই তিরষ্ক্রিয়ার পর যদি আমি তাহাকে ক্ষমা করি, তবে কে বুঝিবে যে, আমি আপনাদিগের অনুরোধেই রামকে দণ্ড দিতে নিরস্ত হইলাম? বীরব্রত বড় স্খলভয়েষ, রাম মহাবীর না হইলে আমি এ অপমান সহ্য করিতে পারিতাম। আপনারা ত অবগত আছেন যে, বীরপুরুষের যশ, একবার কলঙ্কিত হইলে আর তাহা পরিশুদ্ধ হইবার নয়।" পরশুরাম কোন মতেই নিরস্ত হইলেন না দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন, বৎস জামদগ্ন্য, বংশসম্বন্ধে আমি, বশিষ্টদেব এবং শতানন্দ আমরা সকলেই তোমার আত্মীয়, আমাদিগের অনুরোধ অতিক্রম করা তোমার কর্ত্তব্য নয়।

কিন্তু পরশুরাম উপরোধ শূন্য, তিনি বলিলেন, আপনাদিগের অবমাননার জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতে বরং প্রস্তুত, কিন্তু তাহা বলিয়া শস্ত্রগ্রহণব্রত কলঙ্কিত করিতে পারি না। পরশুরাম বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, বরং বারম্বার রামচন্দ্রের অকল্যাণসূচকবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন দেখিয়া,শতানন্দ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।

এবং পরশুরামকে তাঁহার উদ্ধত প্রকৃতির জন্য কঠোর বাক্যে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। উগ্রস্বভাব জামদগ্নের নিকট তাহা বড় অসহ্য বোধ হইল। শতানন্দের সহিত পরশুরামের এই কলহ বর্ণন অতি নীরস এবং দীর্ঘ। স্বভাবত শান্ত প্রকৃতি বশিষ্ঠদেব শতানন্দকে নিরস্ত করিলেন। রাজা দশরথ ও জনক উভয়েই বিবাদ স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং পরশুরামের উদ্ধত-ব্যবহার দর্শনে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরশুরাম আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ। তিনি কাহাকেও অপেক্ষা করিবার পাত্র নহেন; শতানন্দের শাপোদক, রাজন্যগণের ভ্রুকুটী এবং বিশ্বামিত্রের তিরস্কার শুনিয়া, তিনি গর্ব্বিত বাক্যে বলিলেন;—

"ধর্ম্মে ব্রহ্মণি কার্ম্মুকেচ ভগবানীশোহিমে শাসিতা
সর্ব্বক্ষত্রনিবর্হণস্তু বিনয়ংকুর্য্যুঃ কথং ক্ষত্রিয়াঃ
সম্বন্ধস্তু বশিষ্ঠ মিশ্র বিষয়ে মান্যোজরায়াং নতু
স্পর্দ্ধিঃস্বামধিকঃ সমস্ত তপসা জ্ঞানেন চান্যোহস্তিমে॥"

পরশুরাম এইবার আত্মাভিমানের চরম সীমা প্রদর্শন করিলেন। বিশ্বামিত্র অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, আর সহ্য করিতে পারিলেন না। পরশুরামের আত্মাভিমানপূর্ণ বাক্যে তাঁহার ক্রোধ পূর্ব্ব হইতেই উদ্বেলিত হইতেছিল; অতি কষ্টেই তিনি হৃদয়ের বেগ নীরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠদেবের অপমানে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন "অনার্য্য, নির্ম্মর্য্যাদ,

জগৎ সনাতন গুরো বশিষ্ঠেহপি নিরঙ্কুশঃ
ব্যালদ্বীপ ইবাস্মাভিঃরতিব্রমোব দম্যসে।"

বশিষ্ঠদেবের প্রতিও তোমার সম্মান নাই, দুষ্টগজের ন্যায় আজ তোমাকে দণ্ড দিতে হইবে।" ভবভূতি এইস্থলে আপনার শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শমগুণপ্রধান বশিষ্ঠদেবের চরিত্র, অপর কোন কবিই এরূপ স্থলের মধ্যে অথচ সুন্দর রূপে বিবৃত করিতে সক্ষম হন নাই। যখন পরশুরামের আত্মাভিমান পূর্ণ বাক্যে জনক বিশ্বামিত্র ও দশরথ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন, বশিষ্ঠদেব তখনও স্থির, অবিচলিত এবং ব্যথাশূন্য। তিনি পরশুরামের স্পর্দ্ধাপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, ভৃগুর বংশধরের নিকট পরাভব, সে ত গৌরবেরই কথা"*

বায়ুর অভিঘাতে মহীরুহ সকল বিকম্পিত হয়, কিন্তু, পর্ব্বত যেমন তেমনই অবিকম্পিত থাকে। পরশুরাম বিশ্বামিত্রের কথায় বিচলিত হইলেন না। তিনি অহঙ্কারে এবং ক্রোধে, পিতৃ সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া বলিলেন কৌশিক, ক্ষমতা থাকে অগ্রসর হও, এই আমি তোমার ব্রহ্মতেজ অথবা জাতি সুলভ ক্ষত্রিয় তেজঃ বিনাশের জন্য উদ্যত রহিলাম। এই সময় রামচন্দ্র কঙ্কন মোচন সমাপন করিয়া, অন্তঃপুর হইতে আগমন করিলেন। তখন পরশুরাম তাঁহার আহ্বানে, দৃপ্ত সিংহ শাবক যেমন মেঘগর্জ্জন শ্রবণ করিয়া, গজযূথ বিক্ষোভে নিরস্ত হয়, তেমনই জনক বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া "বিমর্দ্দক্ষম" ভূমিতে অবতরণ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

---

* ভৃগু প্রবরাৎ পরাজয় ইতি প্রিয়ং নঃ।

ধর্ম্মমায়া।

সংসারে বিষয়লালসা, ইন্দ্রিয়কামনা, মর্য্যাদাভিলাষ বশতঃ যেমন লোক সকল মায়ামুগ্ধ হয়, ধর্ম্মসমাজের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ মায়ার প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেন সংসারবাসনা রূপান্তরিত হইয়া, নামান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মজগতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এই জন্য পৃথিবীতে ধর্মসংক্রান্ত আড়ম্বর যেরূপ প্রবল, প্রকৃত ধর্ম্মজীবন তাহা অপেক্ষা অনেক কম; এমন কি সময়ে সময়ে মনে হয়, ধর্ম্মও একটী বাণিজ্য ব্যবসায় বিশেষ। সংসার-পথে যেমন লোক সকল ধন মান সুখ বিলাসের জন্য দিবা নিশি মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; ধর্ম্মধ্বজী মানবগণ ধর্ম্মের নামে তেমনি আপনাকে এবং জন সমাজকে প্রতারণা করিয়া নীচ স্বার্থ সাধন করিয়া লইতেছে। বরং অন্ধবিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে সরল বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু নিকৃষ্ট কামনা পরতন্ত্র ধর্ম্মব্যবসায়ীর কার্য্যে এবং কথায় কিছুমাত্র আস্থা বা শ্রদ্ধা জন্মে না। উক্ত উভয় শ্রেণীর লোকের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে নিশ্চয়ই হতাশ হইতে হইবে। যিনি অন্ধ বিশ্বাসী, তাঁহার চক্ষে ধর্ম্মমত এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠান যেরূপ মূল্যবান, প্রকৃত ধর্ম্ম ব্যবহার তেমন মূল্যবান বলিয়া মনে হয় না। তিনি আপনার চির অভ্যস্ত মত সমর্থন এবং কার্য্যসাধনের জন্য এত দূর উৎসাহী হইবেন যে, তাহার অনুরোধে তিনি দয়া ন্যায় নীতি ভদ্রতা সত্যানুরাগ সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে পারিবেন। আপনার কল্পিত ভাব এবং প্রাচীন সংস্কারকে ঈশ্বররূপে গঠন করিতেও তিনি ভীত হইবেন না। যদিও তিনি বিশ্বাসী এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের কিছুমাত্র ত্রুটি তিনি করেন না, তথাপি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে থাকিতে হয়। বিশ্বাস ভক্তি নিষ্ঠা শ্রদ্ধা সত্ত্বেও যদি এইরূপ হইল, তবে যাহাদের উদ্দেশ্য স্বার্থসাধন, তাহাদের কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

সংসার রাজ্যে অবিদ্যার যত প্রকার খেলা আছে, ধর্ম্মের ভিতরে তাহার একটীরও অভাব নাই। একটু অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, সমস্ত গুলি তন্মধ্যে ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন রূপে বিরাজ করিতেছে। কার্য্য দেখিয়া, কথা শুনিয়া সহসা কেহ তাহাদিগকে ধরিতে পারে না; কিন্তু অভিপ্রায়ের দূষিত দুর্গন্ধ, আত্মাভিমানের বিকৃত মূর্ত্তি অধিক কাল প্রচ্ছন্নও থাকে না। পরিশেষে মনুষ্য আপনিও আপনার হৃদগত রোগ বুঝিতে পারে। তখন সে দেখে যে, আত্মা মূলদেশ হইতে ক্রমে শুকাইয়া উঠিতেছে, হৃদয় কল্মষরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে; বিবেকের চক্ষু ক্ষীণদৃষ্টি হইতেছে; তখন বুদ্ধি আর স্ফূর্ত্তি পায় না, ভাবস্রোত আর চলে না, সমস্ত জীবনযন্ত্র যেন বন্ধ হইবার উপক্রম। ঈশ্বর-প্রীতি-কামনায় নিষ্কাম ভাবে সে কি কি করিয়াছে, তাহা আর তখন খুঁজিয়া পায় না। সুতরাং চিত্ত অপ্রসন্ন হয়, আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা জন্মে। তদবস্থায় উপস্থিত হইয়া সে মনে মনে ভাবে, আমি যে সকল

প্রবন্ধ লিখিলাম, তাহাত কীট-দূষিত, ধূলি-ধূসরিত হইয়া ভূতকালের অতীত স্মৃতির মধ্যে মিশিয়া গেল; যে কিছু বক্তৃতাদি করিলাম, তাহাওত আকাশ-বায়ু গ্রাস করিল; সৎকার্য্য সকল জনসমাজের নিম্ন স্তরে গিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইল, তবে এখন হাতে রহিল কি? দেবপ্রভা, আত্মপ্রসাদ কৈ? সংবাদপত্রে আর ত আমার প্রশংসা কেহ লিখিবে না। বক্তৃতা শুনিয়া আর ত কেহ হাততালি দিবে না। এখন আমাকে পুরাতন ভগ্ন পাত্রের ন্যায় অব্যবহার্য্য হইয়া থাকিতে হইল; হায়! তবে কি আমি ধর্ম্মমায়ার চক্রে পড়িয়া আত্ম প্রবঞ্চিত হইলাম? যাঁহার কার্য্য আমি এত দিন করিলাম, তিনি এখন কোথায়? আকাশ প্রতিধ্বনি করিয়া বলে "কোথায়?" তখন নিদ্রিত বিবেক জাগ্রত হইয়া বলে, "তোমার ন্যায় শ্রোতা, বক্তা, লেখক, পাঠক কেবল লোকের মুখ চাহিয়া ধর্ম্ম কার্য্য করে, অতএব তাহাদের পুরস্কার পৃথিবী দিয়াছে; কিন্তু স্বর্গে তাহাদের জন্য পুরস্কার নাই, কেবল অনুতাপ, আত্মশাসন আর প্রার্থনা আছে।"

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

চাকরি করিতে যাই।

"যেওনা যামিনি আজি"—হয়োনা প্রভাত,
কি বলিব মাথায়ও ছাই ভস্ম আর,
হৃদয়ে দারিদ্র্য দুঃখ শক্তিশেলাঘাত,
করিতেছে প্রবাহিত রক্ত শতধার!
নীরবে নিঃশেষে রক্ত হতেছে পতন,
নীরবে অলক্ষ্যে এই হয় অশ্রুপাত,
নীরবে মরমমূল করি বিধূনন,
নীরবে নিঃশেষে এই প্রাণের প্রপাত!
উঠিলে ভাস্কর খুলি পূর্ব্বশার দ্বার,
শুনিবে জীবন "অন্ন চিন্তা চমৎকার!"

১

দরিদ্র বাঙ্গালী যুবা অন্ন নাই ঘরে,
আছে পুত্র কন্যা তার বহু পরিবার,
ক্ষুধায় আকুল শিশু কাঁদিছে কাতরে,
নয়নের জলে বক্ষ ভাসিছে বামার!
বাম করতলে রাখি বিষণ্ণ বদন,
অশ্রুমুখী বিষাদিনী প্রত্যেক নিশ্বাসে
হৃদয় শোণিত করে মহা আন্দোলন,
আতঙ্কে প্রাণের প্রাণ মরে হা হুতাশে!
নহে উগ্রচণ্ডা ধনী তবু ভীত মন,
প্রত্যেক নিশ্বাস উণপঞ্চাশ পবন!

২

প্রতি অশ্রু বিন্দু ওর সপ্ত পারাবার,
প্রলয়ের মহা মেঘ এলান কুন্তল,
বদন কালিমা ওই মহা অন্ধকার,
ঢাকিছে একত্রে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল!
আজিও করুণ কণ্ঠে 'নাথ' সম্বোধনে
অষ্ট বজ্র গর্জ্জে যেন হেন মনে লয়,
চিত্তের জড়তা জন্মে, ভয় হয় মনে—
সংযত হৃদয় রক্ত—আসন্ন প্রলয়!
কাঁদিল—'কি হবে নাথ!' ক্ষুদ্র বালুকণা
উড়িল প্রলয় ঝড়ে কে করে সান্ত্বনা?

৩

'বলনা কি হবে নাথ! কেমনে সহিব,
ক্ষুধায় কাতর শিশু ধরিয়া গলায়
কাঁদিছে করুণ কণ্ঠে, বল না কি দিব
বাছার ও চাঁদ মুখে,—কি হবে উপায়!"
অনশনে ক্ষীণ তনু মলিন বসন,

নিস্তেজ নিমগ্ন দুটি নয়ন মলিন,
শোকে দুঃখে মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন মন
ঢলিয়া পড়িল ওই সোণার নলিন!
উঠিতে অশক্ত শিশু হামাগুড়ি দিয়া,
পড়িল জননী বক্ষে দ্রুত আছাড়িয়া!

৪

নীরব নিস্পন্দ নেত্র মূর্চ্ছিতা ললনা,
নীরব নিশ্চেষ্ট যুবা সম্মুখে তাহার,
নির্নিমেষ নেত্রে দেখে না করে সান্ত্বনা,
ভাবিতেছে ভবিষ্যত ভাগ্য আপনার!
নির্জীব তরুর মূলে ছিন্ন লতা প্রায়,
একটী কুসুম বক্ষে করিয়া ধারণ,
হায়রে কৃশাঙ্গী অই ধূলায় লুটায়
বিলুপ্ত অঙ্গের সেই লাবণ্য এখন!
অবরুদ্ধ কণ্ঠে বামা কহিল আবার
'কি হইবে নাথ!' একে জ্ঞানের বিকার!

৫

'কি হইবে নাথ!" মহা ভীম প্রভঞ্জনে
ক্ষীণ অঙ্গ যষ্টি এই বাঙ্গালী দুর্ব্বল,
এই ক্ষুদ্র বালুকণা উড়িল গগনে
একটু গুরুত্ব নাই—হৃদয়ের বল!

* * * *

৬

ঝরিল একটী অশ্রু যুবার নয়নে,
বিষাগ্নির সপ্তশিখা জ্ঞানের সহিত
প্রবেশিল পুনরায় সংজ্ঞাহীন মনে
শুনিল যুবক কণ্ঠ—ভগ্ন বিকম্পিত!!
"জীবন সর্ব্বস্ব মোর প্রিয় প্রাণেশ্বরি!
পারি না হেরিতে তোরে ধূলায় লুণ্ঠিত,
হৃদয় কণ্টকে বিদ্ধ শতবার করি
কে দেখিতে পারে অই পদ্ম কণ্টকিত?
আয় বক্ষে এইবার, এই শেষ বার
কণ্ঠকের কললতা প্রেয়সি আমার!'

৭

যুবতীর অর্দ্ধ দেহ রাখি অঙ্কতলে
আবার সে ক্ষীণ কণ্ঠ হইল নীরব,
নীরবে ভাসায় যুবা নয়নের জলে
প্রীতির প্রতিমা তার প্রাণের পল্লব।
সেই অর্দ্ধ নিমীলিত বামার নয়নে,
সেই অর্দ্ধ নিমীলিত নব নীলোৎপলে,
বহিল দুইটী ধারা উষ্ণ প্রস্রবণে,
বহিল দুইটী ধারা রজত তরলে!
চারি চক্ষে চারি ধারা চারি ওষ্ঠাধর
মিশিল সে দম্পতীর যুগ্ম পরস্পর!

৮

সময়ের আবর্ত্তনে সরিল সত্বর
সে মুহূর্ত্ত দম্পতীর দুঃখের জীবনে,
একটী একটী কার খসি নিরন্তর
ভগ্নমান দ্বীপ হতে প্রবাহ প্লাবনে
সরিল ও বালুকণা নীল সিন্ধুজলে!
সরিল ও চারি চক্ষু চারি ওষ্ঠাধর,
ভরিল সে শূন্য স্থান তপ্ত হলাহলে,
আবার কহিল যুবা উন্মাদ অন্তর,—
"কত কাল সহিব এ লাঞ্ছনা গঞ্জনা,
নির্দ্দয় বিধির বিধি নিত্য বিড়ম্বনা!"

৯

কিম্বা——
বৃথা দোষি বিধাতায়—দেশের এ দোষ—
সমাজের দোষ এই, নহে বিধাতার,
হেন মূর্খ আছে কেহ যে হয় সন্তোষ
প্রতপ্ত গরল বক্ষে মাখি আপনার?
নির্ব্বূঢ় অজ্ঞান সেই এ বঙ্গ সমাজ
তাহার (ই) প্রীতির কার্য্য বাল্য পরিণয়,
সেই পূর্ণ নির্ব্বোধের বিষময় কাজ
অচিরে প্রসবে এই ফল বিষময়!
বক্ষে করি এই বিষ নরক অনল
প্রবেশে সংসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী দুর্ব্বল!"

১০

"অনভিজ্ঞ সংসারের জীবন সংগ্রামে
প্রতিকূলে দাঁড়াইতে একান্ত অক্ষম,
কত যে বেদনা পায় ফুটে যদি প্রাণে—
একটী দুঃখের অস্ত্র বিষাক্ত বিষম!
নৈতিক ব্যায়ামে নহে হৃদয় সবল;
জ্ঞান বিদ্যা মহত্বের লৌহ আবরণে
নহে সুরক্ষিত প্রাণ নিতান্ত কোমল!
সংসারের আগ্নেয়াস্ত্র মৃদু প্রহরণে
সুখের কুসুম ক্ষুদ্র বিলাসের প্রাণ
নিস্তেজ বাঙ্গালী যুবা মূর্চ্ছিত অজ্ঞান!"

১১

"না খুলিতে বালকের জ্ঞানের নয়ন,
রে পাপিষ্ঠ দুরাচার সমাজ নিষ্ঠুর,
সংসারের এ বিষাক্ত কণ্টক কানন,
প্রবেশ করাও তারে পিশাচ অসুর!
কি যন্ত্রণা কি যাতনা শরীর শিহরে,
কণ্টকে কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত শরীর,
উছলিছে হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে
কালীময় করি বিষ হৃদয় রুধির!
দেখেও দেখনা কিরে, শিশু নিরাশ্রয়
পিশাচ আচারে তোর কত জ্বালা সয়?"

১২

"যাক সেই গত কথা কি বলিব আর,
ফিরাইয়া সময়ের অদৃষ্ট প্রস্তর
কে মুছিতে পারে, হেন আছে সাধ্য কার
বর্ত্তমান জীবনের আগ্নেয় অক্ষর?"

* * * *

* * * *

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি মুছি অশ্রুজল,
প্রীতির প্রতিমা খানি রাখি ভূশয্যায়,
সজোরে চাপিয়া চক্ষে যুক্ত করতল,
বলিল উন্মাদ যুবা—" প্রেয়সি বিদায়,
হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাস প্রীতি সুবাসিত,
প্রাণের জীবনী শক্তি সুধা-প্রবাহিনি!
হৃদয় আতট পূর্ণ উজল শোণিত,
জীবনের মূল মন্ত্র—সিদ্ধি-প্রদায়িনি!
চলিলাম প্রিয়তমে প্রেয়সি আমার,
অনলে কুসুম ভস্ম দেখিবনা আর!"

১৪

" যাই প্রিয়ে যদি স্বাধীনতা বিনিময়ে—
কি উপায় আছে আর? বাঙ্গালী দুর্ব্বল,
পরের পাদুকাঘাতে সুধু প্রাণ লয়ে
দাসত্ব করিব এই আশার সম্বল!
যাই প্রিয়ে যদি অর্থ পারি উপার্জ্জিতে
এ হেন দাসত্ব ক'র বেচিয়া পরাণ,
যাই যদি পারি তোর অশ্রু মুছাইতে
বদন সরোজ যাহে সদা ভাসমান!
যাই, যদি ইহাতেও বিধি সাধে বাদ
তবে—
প্রীতির পবিত্র এই শেষ আশীর্ব্বাদ!"

১৫

আবার মোহান্ধ যুবা যুবতীর পানে
স্থির মনে স্থির নেত্রে স্থির দৃষ্টি করি,
চুম্বিল সে বিম্বাধর বজ্রাহত প্রাণে,—
কহিল করুণ কণ্ঠে " প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি!
যাই তবে বায়ুবিশ্ব সাগরে ভাসিয়া
কালের তরঙ্গ শিরে, জানি না কোথায়
দ্বিতীয় তরঙ্গ পুন করে আঘাতিয়া
প্রাণের এ বায়ু বিন্দু বায়ুতে মিশায়!
যাই যদি পোড়া বিধি সাধে হেন বাদ,
তবে—
প্রীতির পবিত্র এই শেষ আশীর্ব্বাদ!"

১৬

" কত কষ্ট দিয়াছি যে জীবনে তোমার,
যাই প্রিয়ে, সে সকল করিওনা মনে,
জানি আমি এ জনমে ক্ষমা নাই তার
চাও একবার শেষ প্রীতির নয়নে!

যাইবে অবোধ শিশো !—হে করুণাময়,
দীনবন্ধো ! বাঁচাইও এ দীন সন্তান,
স্বর্গের করুণা তব চির সুধাময়,
রাখে যেন অভাগিনী দুঃখিনীর প্রাণ !
এমন আত্মীয় নাই একজন আর
রক্ষিবে যে অভাগার দীন পরিবার !"

১৭

"কাঁদিলে করুণকণ্ঠে শিশু নিরাশ্রয়
এমন বান্ধব নাই করিতে সান্ত্বনা,
অপার দোসর নাই বিপদ সময়,
তোমার আশ্রিতা এই দরিদ্র ললনা !
রাজা প্রজা ধনী দীন—সমস্ত সংসার,
জীব জন্তু তরুলতা শ্যাম তৃণ দল,
সকলে সমান পাত্র তব করুণার,
তুমিই করুণাময় ভরসা কেবল !
যাই তবে—চলিলাম প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি,
পবিত্র প্রীতির শেষ আশীর্ব্বাদ করি !"

১৮

"যাই. প্রিয় জন্মভূমি জননি আমার !
ভুলেছ কি গত কথা ?—আছে কি মা মনে ?
সহিয়াছি কত শত প্রেত অত্যাচার
জননি ! তোমার তরে অকাতর মনে ?
ন্যায়ের পবিত্র বক্ষে করি পদাঘাত
অকালে যে দিন হায় করি চুর চুর,
পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি মাগো অকস্মাৎ
ভেঙ্গেছে সৌভাগ্য মোর সোণার মুকুর !
কিন্তু—
এতেও সুখের নাহি ছিল পরিসীমা
মুছিত যদি মা তোর কলঙ্ক কালিমা !"

১৯

"কিন্তু তাহা হইল না—হবে একদিন,
অবশ্য জননি, কোন পুত্র পুণ্যবান
(ঘন অন্ধকারে শশী নহে চির লীন)
মুছাইবে ও কালিমা কলঙ্ক নিশান !
যাই তবে জননি গো বিদায় এখন,
যাই হে স্বদেশবাসি ! মনে রে'খ ভাই,
তোমাদেরি তরে সহি এত নির্যাতন,
বিড়ম্বিত হইলাম বর্ব্বরের ঠাঁই ।
যাক্ সে কথায় আর করিনা বিবাদ,
পবিত্র প্রীতির কর শেষ আশীর্ব্বাদ !"

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস ।

উত্তর ।

আষাঢ় মাসের নব্যভারতে 'ঈশ্বর বিশ্বাস ও দার্শনিক প্রমাণ' প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারে ঈশ্বর নির্ণয় অসম্ভব, কারণবাদ এবং কৌশলের যুক্তি, কেবল অযুক্তিরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ঈশ্বর জ্ঞান নিত্যপ্রত্যক্ষ। এই শেষ কথার প্রকৃত অর্থ কি ? আমি স্বাভাবিক এবং নিত্যপ্রত্যক্ষ অর্থ অবশ্যই দার্শনিকের ভাষায় ব্যবহার করি নাই ; প্রচলিত শব্দের সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। সেই সমুদয় কথা বিশেষ করিয়া অন্য এক প্রবন্ধে উল্লেখ করিব, এবং আমি কেন যে ঈশ্বর বিশ্বাস করি, পাঠক মহাশয়দিগের কাছে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিব, এরূপ প্রতিশ্রুত ছিলাম।

কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত প্রবন্ধের অবতারণার পূর্ব্বে কতকগুলি আনুষঙ্গিক কথা এবারে

বলিতে হইবে। সুশিক্ষিত, (এবং তাঁহার নিজের কথায়) চিন্তাশীল এবং ধর্ম্মানুরাগী বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়, গত শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে আমার সেই প্রবন্ধের একটী সমালোচনা করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা না বলিলে এখন অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব। প্রথমত, সীতানাথ বাবু, আমার ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার অগভীরতা দেখিয়া যে কতকগুলি স্থূলদর্শী পণ্ডিতের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে এবং ব্রহ্মবাদী দার্শনিকের সহিত পরিচিত হইতে আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যুক্তির উত্তর না হইলেও তিনি যখন ব্যবহার করিয়াছেন, তখন আমিও, তাঁহাকে এই উপদেশের জন্য ধন্যবাদ দিবার জন্য, তাহার উল্লেখ করিয়া বোধ হয় অধিক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিলাম না। দ্বিতীয়ত, আমি ভূমিকায় ধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়দিগের যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলাম, তাহাতে একথা মনে করি নাই যে, যাঁহারা যুক্তি তর্ক বলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তাঁহারা সাধক ভক্ত নহেন। শ্রেণী বিভাগে, অবলম্বিত স্বীয় স্বীয় প্রচার প্রণালীর কথাই বলা হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্থলে মার্টিন্থ এবং ফেনেলোঁকে গ্রহণ করা যাউক। মার্টিন্থর সাধুতা ও ভক্তিভাব ফেনেলোঁ অপেক্ষা এক চুলও কম নহে, কিন্তু একের প্রচার প্রণালী—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি, এবং অপরের প্রণালী কেবলই ধর্ম্মাভিজ্ঞতা প্রদর্শন। ফেনেলোঁর পাণ্ডিত্য কত ছিল, কে না জানে; মার্টিন্থর ঋষি-চরিত্র কাহার অবিদিত? কিন্তু ফেনেলোঁ, যুক্তি তর্ক ভাল বাসিতেন না, এবং মার্টিন্থ উহার উপযোগীতা বিশেষরূপে স্বীকার করেন। আমিও এই হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছি। নাম ঐতিহাসিক না হইলে, জীবিত লোকের চরিত্রের প্রশংসাদি সাহিত্যে কীর্ত্তিত হওয়া সাহিত্য-নীতির বহির্ভূত না হইলে, আমি সীতানাথ বাবুর অপেক্ষা, অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া, নগেন্দ্র বাবু এবং সীতানাথ বাবুর কথা উল্লেখ করিতাম। সুতরাং সংক্ষেপত এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, শ্রেণী বিভাগের অর্থ সীতানাথ বাবু যেরূপ বুঝিয়াছেন, আমি সেরূপ বুঝাই নাই। তৃতীয়ত, সীতানাথ বাবু প্রশ্ন করিয়াছেন যে, দার্শনিক বিচার যদি বিড়ম্বনা, তবে, আমি কি যুক্তি বলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, এবং আমার নিত্যপ্রত্যক্ষ কথারই বা অর্থ কি? তাঁহার প্রস্তাবের উত্তর না দিতে হইলে, এই বারই তাঁহার এ প্রশ্নের উল্লেখ করিতাম, কিন্তু উত্তর দেওয়া অগ্রে প্রয়োজনীয় বলিয়া সে প্রস্তাব এবারকার মত এখানে স্থগিত থাকিল। তবে একটী কথা বলি, তিনি যে আমার ব্যবহৃত নিত্য-প্রত্যক্ষ শব্দ দার্শনিকদিগের (Intuition) নামক অপূর্ব্ব পদার্থে অভিহিত করিয়া, "দার্শনিক বিচার" কথাটার অর্থ বুঝিতে আমার ভ্রম আছে, ভাবিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। আমি "যুক্তি তর্কের ভূমি ছাড়াইয়া এক বিশ্বাসের ভূমি" দেখাইব। এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, সেই ভূমি শিলা অপেক্ষাও দৃঢ়, কল্পনার গন্ধও সেখানে নাই। অধিকন্তু (নব্যভারত সম্পাদকের ভাষায়) ইহাও দেখাইব যে, "তর্ক ও যুক্তিতে যে ঈশ্বর বির[illegible] তাহাকে আমরা ঈশ্বর বিশ্বাস বলি[illegible] সে কল্পনার ক্রীড়া— মস্তিষ্কের খেলা!" চতুর্থত, সীতানা[illegible] বাবু বলিয়াছেন যে, আমি তাঁহার গ্রন্থখানা

ভাল করিয়া পড়ি নাই। ভাল শব্দের ওজন নাই, কিন্তু একথা বলিতে পারি যে, শিক্ষা লাভের জন্ত তাঁহার গ্রন্থখানি মনোযোগের সহিত দুই বার পড়িয়াছি। তবে তাঁহার যুক্তি গুলির সর্ব্বস্থল উল্লেখ না করিবার হেতু ছিল; আমার প্রবন্ধ তাঁহার ও নগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থের সমালোচনায় লিখিত হয় নাই; একটী (আমার সঙ্কল্পিত) প্রবন্ধের ভূমিকা স্বরূপে লিখিত হইয়াছিল। সাধারণত ঈশ্বর প্রমাণার্থ যে সকল যুক্তি ব্যবহৃত হয়, তাহারই সমালোচনা করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন Roots of faith এবং ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা নামক অতি সুন্দর, সুপাঠ্য ও সহজবোধ্য গ্রন্থদ্বয় এদেশে রহিয়াছে, তখন আমার বিপক্ষীয়দিগের যুক্তি ক্লিন্ট ও কেয়ার্ড হইতে না তুলিয়া, ঐ গ্রন্থদ্বয় হইতেই যথা সম্ভব তুলিয়াছি; এবং গ্রন্থদ্বয় নূতন বলিয়া পাঠকদিগের কাছে পরিচয় করিয়া দিয়াছি। সীতানাথ বাবু যে কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থেরই এক মাত্র সমালোচনায় সম্ভবপর। পঞ্চমত, আমি অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এত কথার আলোচনা করিলাম কেন? আমি যত কথার অবতরণ করিয়াছি, সে গুলির মীমাংসাতেই সমগ্র ইংরাজি দর্শন শাস্ত্র। আমি কিছু সেই সকল দর্শন শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ করিতে বসি নাই; বিশেষত সে কার্য্য নানা কারণেই আমার সাধ্যাতীত। আমি দেখাইয়াছি যে, দার্শনিকদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী, এবং তাহারই এক শ্রেণীর যুক্তি অধিক প্রবল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সীতানাথ বাবু তাঁহাদিগকে স্থূলদর্শী বলিয়াছেন, আমিও ব্রহ্মবিদ্যাবিদ দার্শনিকদিগকে ইহাদের অগভীর বলিয়াছি; সেটা গেল কথার লড়াই। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রের সহিত আমার ন্যায় অন্তত অল্প পরিমাণেও পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, উভয় শ্রেণীরই বলিবার অনেক কথা আছে। যদি ছোট বড় বিচার ত্যাগ করা যায়, তবুও কি বলা যায় না যে, উভয়ের বিবাদের কিছুই নিষ্পত্তি হয় নাই? যিনি ঘটনাক্রমে যে পক্ষ প্রবল মনে করেন, তিনি তাঁহাদেরই মীমাংসা অবলম্বন করেন? সেই জন্যই আমি ঈশ্বর-প্রমাণকারীদিগের বিরোধী পক্ষীয় যুক্তি গুলির আভাসমাত্র দিয়া ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, এ সংগ্রাম কখনও মিটিবে না,—অন্তত সহজে মিটিবে না; এবং ঈশ্বর প্রমাণ, দার্শনিক যুক্তিদ্বারা অসম্ভব, অথবা এখনও সম্ভব হয় নাই। সীতানাথ বাবু স্পেন্সার প্রভৃতিকে অগভীর বলিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের হৃদয়ের উপর তাঁহার যে কি প্রকার প্রভুত্ব, একবার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? আমি লোকরঞ্জন যুক্তি (Argumentum ad hominum) দিতেছি না; তবে আমি যে সকল কথার আভাস দিয়াছি, তাহার বল বড় কম নহে, ইহাই বলিতে চাহি। আমার মূল প্রবন্ধের ভূমিকায়, কাজেকাজেই, কেবল দর্শাভিজ্ঞদিগেরই জন্য অতি সংক্ষেপে সকল প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া, দার্শনিক যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর প্রমাণ অসম্ভব, এই কথা বলিয়াছিলাম। এই পর্য্যন্ত গেল আমার কৈফিয়ৎ। এখনও সীতানাথ বাবুর প্রতিবাদের কথা কিছু বলি নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ অপেক্ষা ডালের প্রভাব বাড়িয়া চলিল, সংক্ষেপে সীতানাথ বাবুর যুক্তির বিরুদ্ধে

কিছু বলিয়া নিজের কথা সম্ভবত পরবারেই আরম্ভ করিব।

সীতানাথ বাবু বলিয়াছেন যে, আমি কারণবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝি নাই। যাহা হউক, এবারে সীতানাথ বাবুর নিজের ভাষায় কারণবাদের অর্থ বুঝিতে একবার চেষ্টা করি। Roots of Faith গ্রন্থে ইহার বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে যে, "Phenomena, by their very nature are dependent, passive, inert, inactive. To say therefore that they can change, can act, of themselves (can appear, dis appear or be transformed,) is to say, that, in active things can act—a manifest contradiction. Wherever therefore, there is a change, there must necessarily be an agent behind it, as its cause." এই যে পরিদৃশ্যমান ঘটনাপুঞ্জ বা জগৎ বা জাগতিক প্রকাশ, সীতানাথ বাবু ইহাকে পরমুখাপেক্ষী, নিশ্চল এবং কার্য্যাক্ষম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এবং বলিয়াছেন যে ইহারা আপনাপনি আবির্ভূত, তিরোহিত বা রূপান্তরিত হইতে পারে না। তবেই নাকি বুঝা যাইতেছে যে, ইহাদের পশ্চাতে কেহ কারণ রূপে বর্ত্তমান আছেন। পণ্ডিত ও কবি বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী গ্রন্থ নামক উপন্যাস হাতে নাই, যতদূর স্মরণ হইতেছে, সেই গ্রন্থে রজনীর প্রেমে সন্ন্যাসী অমরনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন "ঐ যে শিয়াল কাঁটার ফুলটী, উহারই তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য, ডারুইন, হকস্লে, টিণ্ডাল ও লায়ল, একাসনে বসিয়া আজন্ম চেষ্টা করিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।" অদ্বিতীয় কবি এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গেটে এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "লোকে সৌন্দর্য্য-পিপাসায় চন্দ্রসূর্য্য দেখে, আমি কিন্তু একটা ক্ষুদ্রতম বালুকা-কণার সৌন্দর্য্যও বিশেষ করিয়া তৃপ্তির সহিত দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। যে জগতের সামান্য বালুকা-কণার কথা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তোমার চক্ষে অনন্ত রহস্যময়, সে জগতের সিদ্ধান্তে কোন্ সাহসে বলিব যে, পদার্থপুঞ্জ পরমুখাপেক্ষী, নিশ্চল ও কার্য্যাক্ষম? ধর্ম্ম প্রমাণকারী দার্শনিকদিগের মধ্যে সাধারণত একটী দোষ লক্ষিত হইতেছে; সে দোষ এই যে, যেখানে কেহ কিছু বুঝিতে পারে না, বা এখন পর্য্যন্ত পারে নাই, সেখানে একটা সিদ্ধান্ত করা। সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞান ও দর্শনের রাজ্যে সর্ব্বথা পরিহার্য্য। মিবার্ট হইতে সীতানাথ বাবু পর্য্যন্ত সকলেই এই দোষে দোষী। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের নব্যভারতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "ঈশ্বর সচেতন কি অচেতন" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, বিজ্ঞান শাস্ত্র জীবনোৎপত্তির বিষয় কিছু প্রমাণ করিতে পারে নাই, এবং দেখাইতে পারে নাই যে, পদার্থ হইতেই চেতনের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, চৈতন্যময় আত্মা স্বতন্ত্র রূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, এ কি প্রকার মীমাংসা? আজিও বুঝিতে পারা যায় নাই যে, সূর্য্যের উত্তপ্ত বুকে জীবনাঙ্কুর থাকিতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি কখনও বুঝিতে পারা যায়? ঐ যে বালুকা-কণা, যাহাকে জড় নামে আখ্যাত করিতেছ, বলিতে পার কি যে, উহারই সংযোগ ও বিয়োগে বুদ্ধদেব ও কপিলের বিকাশ কি না? প্রমাণ হয় নাই বলিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।*

* জড় হইতে চেতনের বিকাশ সম্ভব বলিয়া আজিকালি আমার অনেক বড় বড় পণ্ডিত মানিতে

সেই জন্যই বলিয়াছি, যদি সীতানাথ বাবু এ জগতের কারণ চাহেন, তবে কারণের কারণ চাহিতে তিনি কোন্ যুক্তিতে বাধা দিবেন? এ কথারও নাকি তাহার উত্তর আছে, সে উত্তর একবার পরীক্ষা করা যাউক। সীতানাথ বাবু বলেন যে আমরা তাহারই কারণ প্রার্থনা করি, যাহা অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল ইত্যাদি; সেই জন্য জগতের কারণ প্রার্থনা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কিছুকে কারণ বলিতে হয় ত সে অবশ্যই আদিকারণ হইবে, এবং আদিকারণ হইতে হইলে তাহাকে স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনশীল প্রভৃতি হইতে হয়; নতুবা আদিকারণ কথা অর্থশূন্য হয়। সীতানাথ বাবুর এ যুক্তি স্পেন্সারের কারণবাদের যুক্তি। কিন্তু এযুক্তিতে ছিদ্র আছে। এই জগৎ দেখিয়া স্বভাবতই মনে হয়, ইহাকে কে করিল, এখন যদি কারণ মানিতে হয়, তবে বর্ণিত আদিকারণই গ্রহণ করিতে হইবে। এইত আসল কথা। কারণ-শৃঙ্খল অনন্ত, এই অনন্তশৃঙ্খল ভাবিতে পারি না, ইহাতে উত্তরও মিলে না, কারণ স্থিরও হয় না; কাজেই কারণ স্বরূপে আদিকারণ মানা স্বাভাবিক। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, পদার্থের কারণ বলিয়া প্রশ্নকরিবার আদৌ শিরঃপীড়া কেন? এবং আদিকারণও কি সেই স্বীয় সৃষ্ট শিরঃপীড়ার কল্পিত ঔষধিমাত্র নয়? স্পেন্সার কহেন যে, সীমাবদ্ধ জীবের অস্তিত্বের অবস্থা মাত্রেই, তাহার পক্ষে এই কারণ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। ভাল কথা। যাহা স্বাভাবিক তাহাই যে আবার সত্য, একথা কে বলিল? হইতে পারে, আমরা কারণ খুঁজি; এবং যখন কারণ খুঁজি তখন কাজেই আমাদিগকে আদিকারণ জানিতে হয়। আমি বলি যে, আদিকারণ ভাবিয়া রোগ নিবৃত্তি অপেক্ষা রোগটা থাকাই ভাল। ঘটনামাত্রের efficient cause না ভাবিয়া, তাহাদিগকে রহস্যময় করিয়া রাখাই সর্ব্বথা যুক্তি সিদ্ধ। এই জন্যই প্রত্যক্ষবাদী হইয়া "স্থূলদর্শী দার্শনিকদিগকে আদর্শ করিয়া" জড় শরীর যন্ত্রের বিকাশ প্রণালীকেই (অচৈতন্য হইতেই) চৈতন্য, স্মৃতি আশা প্রভৃতির জন্মের কথা বলিয়াছিলাম। অচেতন লক্ষনাক্রান্ত ডিমের পরিণতিই চৈতন্যবিশিষ্ট জীব। 'Not consciousness হইতে consciouness' না বুঝিতে পারি, কিন্তু "হইতেই পারে না", এ সিদ্ধান্তকেও অতিরিক্ত সাহসী (too bold an assertion) বলিতে বাধ্য হইলাম। * প্রত্যক্ষ যাহা দেখি তাহা ঐ পর্য্যন্তই। তাহা যদি মীমাংসা বলিয়া বোধ না হয়, চুপ করিয়া থাক। অতিরিক্ত মীমাংসা অনধিকার প্রবেশ।

ঈশ্বর ইচ্ছাময়, জগৎরূপিকে ইচ্ছা অহেতুকি নয়, ইহাতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব যে মনুষ্যত্বে পরিণত হয় না, এই কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য সীতানাথ বাবু লিখিয়াছেন যে,

---

আরম্ভ করিতেছেন। এসম্বন্ধে ক্ষীরোদ বাবুর কোন কোন প্রবন্ধে পাঠক মহাশয়গণ, ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতের পৃষ্ঠায় আভাস পাইয়াছেন। তাঁহার মানবপ্রকৃতি দ্বিতীয় ভাগে ইহার সবিস্তার আলোচনা আছে।

* স্পেন্সারের কারণবাদ পড়িয়া আমার একজন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, স্পেন্সার টানাটানি করিয়া যে কারণ মানিয়াছেন, তাহাকে আর এক পাক দিলেই Mill এর অনন্ত শৃঙ্খলায় ঝুঁকিয়া পড়িবে। সত্য কথা বটে। এ সম্বন্ধে হিউমের প্রবর্ত্তিত মত আজিও অটল রহিয়াছে।

"তাঁহার (ঈশ্বরের) ইচ্ছা অহেতুকি নহে, তাঁহার ইচ্ছার হেতু আছে, কিন্তু সেই হেতু তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র কিছু নহে; তাঁহার ইচ্ছার হেতু অনন্ত প্রেম, এই অনন্ত প্রেম তাঁহার প্রকৃতির অঙ্গীভূত; ঈশ্বর অনন্ত প্রেমময় বলিয়া ইচ্ছাময় এবং কার্য্যশীল; কোন বাহিক কারণের প্রভাবে নহে।" পাঠক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি, কেহ ইহার কোন অর্থ বুঝিয়াছেন কি? অন্তত আমিত বুঝি নাই। কতক গুলি তত্ত্ব বিদ্যার বৃথা কথা (Theological cant) ব্যবহৃত হইয়াছে এই মাত্র। ইচ্ছার কারণ কি? না প্রেম। জিজ্ঞাসা করি যে, প্রেম অর্থ কি? তাহাও আমাদের প্রেমের একটা বড় রকম ছবি নয় কি? সকল যুক্তি, এখানে এক "অনন্ত" কথার উপর নির্ভর করিতেছে। এই অনন্ত অর্থ কি? একটা (Indefinite) না-বুঝিবার-কথার এলোমেলো বিন্যাস নয় কি? হয়ত বলিবেন, তুমি বুঝিতে বড় গোলকর; তাহা বলিলে নিতান্তই নাচার।

প্রবন্ধের উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া এবিষয়ের মীমাংসার্থ ও আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য এই উত্তরের সমালোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা আমার সঙ্কল্পিত প্রবন্ধ (যাহাতে আমি কেন ঈশ্বর বিশ্বাস করি, লিখিব) প্রকাশিত হইলে, করিলে বিশেষ কৃতার্থ হইব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আদি সৃষ্টি শক্তি ও তাহার তিন রূপ বিকাশ।

আধুনিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে জগতের গূঢ় তত্ত্ব মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষার বলে যত দূর যাইতে সমর্থ না হয়—দর্শন আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে সেই দুর্জ্ঞেয় স্থানে প্রবেশ করিতেছে। যে সকল তত্ত্ব এত দিন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল—তাহা এক্ষণে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে।

আমরা এ স্থলে বিজ্ঞানের স্থূল সত্য মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহি না, জগতের যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব, দর্শন, অসাধারণ প্রতিভা বলে আবিষ্কার করিয়াছে—এবং বিজ্ঞান যুক্তির দ্বারা—প্রমাণের দ্বারা যাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া যতদূর সম্ভব একরূপ অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছে—সেই সমস্ত মূল তত্ত্ব গুলি কি, তাহা আমরা দেখাইব।

জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় হইলেও অধুনা বিবর্ত্তনবাদ তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি কিরূপে সংসাধিত হয়, কিরূপে সৌরজগত, নাক্ষত্রিক জগতের উৎপত্তি হয়—কিরূপে তাহা গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্য রূপে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়—এ কথা আধুনিক বিবর্ত্তনবাদ মীমাংসা করিয়াছে। কিরূপে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি হইয়াছে—জীবের সৃষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে, তাহাও বিবর্ত্তনবাদ দেখাইয়া দিয়াছে। আমরা এ সব বিস্তৃত কথার এ স্থলে মীমাংসা করিব না।

আমরা এই বিবর্ত্তন নিয়মের অধীন এইমাত্র জগতের মূলে কোন স্থায়ী পদার্থ, কোন সংবস্তু নিহিত আছে কি না, এবং সেই সংবস্তুর কিরূপ শক্তি বিকাশে এই

বাহ্য জগত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই দেখাইব। এ স্থলে একটা গুরুতর দর্শনের কথার উল্লেখ করিয়া এ কথা বুঝাইব। এই জগতের যাহা আমরা জানিতে পারি, মনে করি, তাহা প্রকৃত বাহ্য জগতের কিছুই নহে। তাহা আমাদের মনের বিকার মাত্র। বাস্তবিক,—

"Man in fact, does not know any thing of substances; he knows neither minds nor bodies; he perceives only transient, isolated, internal conditions he makes; use of them to affirm and name exterior states, positions, movements, changes and avails himself of them for nothing else."

H. A. Taine.

মনে কর, আমরা যে লাল নীল পীত প্রভৃতি পদার্থের নানা রূপ দেখিতেছি, এ গুলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুকম্পন বই আর কিছুই নহে। শব্দও ত নানা রূপ অনুকম্পন মাত্র। আবার অনুকম্পনের মূল কথা কি, তাহাও ত জানি না, কারণ অনুকম্পনও মনের অবস্থা বিশেষ। সুতরাং যাহাকে আমরা রূপ বা শব্দ বলি, বাহ্যিক জগতে তাহার স্বরূপ কি, তাহা জানি না। সকল বিষয়েরই এই নিয়ম। বাহ্য জগতের স্বরূপ আমরা বুঝি না।

কিন্তু তাই বলিয়া বাহ্য জগত যে নাই, তাহা বলা যায় না। দর্শনের মায়াবাদ বা Idealism আর Realism বা Phenomenalism লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল, এখন তাহারা পরস্পর পরস্পরের ভ্রম বুঝিয়াছে—এখন একরূপ স্থির হইয়াছে যে জগত সত্য, তবে আমরা তাহার স্বরূপ জানি না।

"Our conclusion is simply this that no theory of phenomena, external or internal can be framed without postulating an Absolute Existence of which phenomena are manifestations. Absolute existence therefore,—the reality of which persists independently of us, and of which Mind and Matter are the phenomenal manifestations—can not be identified either with mind or with matter."

Fiske's Cosmic Philosophy Vol. I. p 88

পণ্ডিত স্পেন্সর সাহেব বলিয়াছেন,—

"Matter and Motion are both regarded by me as modes of manifestations of Force, and that force is the correlation of that Universal Power which transcends conciousness."

First Principles p. 579.

প্রসিদ্ধ দার্শনিক মিল্ (J.S. Mill) সাহেবও এতটুকু স্বীকার করেন যে "There exists in nature a number of Permanent Causes. * * But we can give no account of the origin of the Permanent Causes themselves." Logic I. p. 378.

অতএব যদিও বাহ্য জগতের যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা বাহ্য জগতের স্বরূপ নহে, তথাপি বাহ্য জগতের অন্তরালে যে অনন্ত অজ্ঞেয় শক্তি সংস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমরা যে বাহ্য জগত প্রত্যক্ষ করি, তাহা প্রকৃত বাহ্য জগতের জ্ঞান নহে, তাহা অজ্ঞান জড়িত আমাদের মনোভাব মাত্র। এই অজ্ঞানের অন্তরাল দিয়া যখন আমরা এই সবস্তু অনুভব করিতে পারিব—এই সৎস্বরূপ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইলেও, (Transcends consciousness) হইলেও, যখন আমরা তাহাকে ধারণা করিতে পারিব, তখনই আমরা অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দ্বারে আসিব।

সে যাহা হউক, আমরা ফিস্ক ও স্পেন্সরের কথায় পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, বাহ্য জগতের যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান তাহাকে তিন

ভাগেই বিভক্ত করে। ইহারা Matter বা জড়, Motion বা গতি এবং Mind বা মন। অথবা ইংরাজী কথায় ইহারা তিনটী (M) এম্। বিবর্ত্তনবাদই বল আর যাহাই বল, সকলই এই তিন ভিত্তির উপর স্থাপিত। এক কথায় বাহ্য জগতের যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহার মূল এই তিনটী।

প্রথমত, এই অনন্ত সৃষ্টির অসংখ্য স্থূল পদার্থ মধ্যে পণ্ডিতগণ দুইটী মূল সত্য স্থির করিয়াছেন—"জড়" ও গতি"। যেখানে যে পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, তাহার মধ্যে "জড় ও গতি" এই উভয়ই সম্মিলিত থাকে, কখনই এই সম্মিলিত অবস্থার অন্যথা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। বিবর্ত্তনবাদ স্থির করিয়াছে যে, পদার্থের যতই জড়ত্ব বৃদ্ধি হইবে, ততই গতির হ্রাস হইবে—আর যতই জড়ত্বের হ্রাস হইবে, ততই গতি বৃদ্ধি হইবে। জড় জগতের বিকাশের সময়—অথবা প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্ট কালে—জড়ের আধিক্য ও গতির হ্রাস, আর তাহার বিনাশের সময় জড়ত্বের হ্রাস ও গতির আধিক্য হয়।

কিন্তু জীব সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র। এস্থলে স্থূল সূক্ষ্ম উভয়ই একীভূত, জড় ও গতি উভয়েরই আধিক্য থাকে। গতি রূপান্তর হইয়া জড় শরীরে প্রবেশ করে। তাই জড়ের জড়ত্ব নষ্ট হইয়া যায়। জড় হইতে জীব জগতে প্রবেশ করিবার সময় এই এক নূতন তত্ত্ব দেখিতে পাই। জীব জগতে জড় ও গতি মিশামিশি মাখামাখি হইয়া আছে। কিন্তু সচরাচর আমরা জড় জগতে গতি যে ভাবে দেখিতে পাই, জীব জগতের গতি সেরূপ নহে। জীব জগতে প্রবেশ করিয়া গতি অন্য রূপ হইয়াছে। তাহার নাম আর এখন ভৌতিক গতি বা আনবিক গতি নহে—তাহা এক্ষণে জৈবিক গতি, তাহা স্বতন্ত্র পদার্থ।

বিজ্ঞানের এত বড় একটা গুরুতর কথা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝান যায় না। দেখ যাহাকে পরমাণু বলি—যাহা জড়ের সূক্ষ্মতম অণু—তাহার মধ্যে কি একরূপ গতি নিহিত থাকে। যখন পরমাণুতে পরমাণুতে কোন সংশ্রব থাকে না, তখন এই গতি পরমাণুর মধ্যেই কোথায় লুক্কায়িত (বা বিজ্ঞানের কথায় Latent) অবস্থায় থাকে। যখনই পরমাণু আসিয়া আকর্ষণ (অথবা কিসের) বলে অন্য পরমাণুর সহিত মিশিয়া যায়—তখন সেই গতির কতকাংশ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়—তখনই পরমাণুর সহিত গতি আমরা দেখিতে পাই। দেখ একটা অক্সিজেন্ অণু একটা হাইড্রোজেন্ অণুর সহিত আসিয়া মিলিল। মিলনের সময় এক অদ্ভুত গতি উৎপন্ন হইয়া, তোমার কাছে তাপ রূপে প্রতীয়মান হইল। এই রূপ হাইড্রোজেন অণু আর একটা হাইড্রোজেন অণুর সহিত যখন মিলিয়াছিল, যখন তাহার (Nascent) আনবিক অবস্থা গিয়া Molecular বা অণুকাবস্থা আসিয়াছিল, তখনও এইরূপ কতকটা গতি মুক্ত হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা গেল, অণু অবস্থা থাকিতে পারে না। কিন্তু যখনই আনবিক অবস্থা গিয়া যৌগিক, বা Molecular অবস্থা হইয়াছে—তখনই কত গতি এইরূপে স্বাধীন হইয়াছিল। এই অণু কোথা হইতে আসিল, বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না। তবে বিজ্ঞান এই মাত্র বুঝে যে, তাহারা সৃষ্ট।

"We have reached the utmost

limit of our thinking faculties when we have admitted that, because matter can not be eternal and self-existent it, must, have been created."

Clark Maxwell, on "Atom."

যাঁহারা ইহার অধিক বুঝিতে চান, তাঁহারা আর বিজ্ঞানের পথে যান না, কল্পনা বা দর্শন বলে বুঝিতে চেষ্টা করেন। এই সকল লোকে পরমাণু গুলিকে, এবং তাহার আনুষঙ্গিক গতিকে, কোন এক আদি শক্তি হইতে সৃষ্ট বিবেচনা করেন। বাস্তবিক বিজ্ঞানের সন্দেহের সীমা অতিক্রম করিয়া, এই পথ ব্যতীত জ্ঞানের অগ্রসর হইবার আর অন্য পথ নাই।

শুধু ইহাই নহে। কোন্ সময়ে পরমাণু সৃষ্টি হইয়া যে যৌগিক দ্বণুক প্রভৃতি সৃষ্টি হইল—ও তাহার সহিত এই গতির স্বাধীন স্ফূর্ত্তি হইল, তাহাও বিজ্ঞানের সীমার অতীত।

"The formation of molecule is an event not belonging to that order of nature under which we live."

C. Maxwell.

সে যাহা হউক, আমরা যাহা বলিলাম বোধ হয় ইহাতেই পাঠকগণ একরূপ বুঝিয়াছেন যে, অণুতে অণুতে মিলিলে গতির আবির্ভাব হয়। সেইরূপ এক দ্বণুক বা ত্রাণুকের সহিত আর এক দ্বাণুক বা ত্রাণুক মিলিলেও গতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকলেই জানেন, চুনের সহিত হরিদ্রা মিলাইলে বড়ই উত্তপ্ত হয়—ইহাই আনবিক গতির লক্ষণ। প্রায় সকল স্থানেই এই সাধারণ নিয়ম। জড়ের সহিত জড় মিলিলেই গতির মুক্তি। আর জড় হইতে জড় বিচ্ছিন্ন হইলেই গতির অবরোধ হয়। সকল রাসায়নিক ক্রিয়ারই এই নিয়ম।

এই জড় ও গতির কথা বলিবার সময় একটা কথা বলা হয় নাই। সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে, এই গতির মূলে একটা শক্তি নিহিত আছে। স্বতঃ গতি সম্ভব নহে। ইহার মূল কারণই এই শক্তি। শুধু গতি বলিয়া নহে, বলিয়াছিত, জড়েরও একটা মূল কারণ আছে। বিজ্ঞান বলে যে, জড় পরমাণুগুলি সৃষ্ট। কিন্তু যাহা ছিল না তাহা হইতে পারে না, এই পুরাতন কথা আজ বিজ্ঞান, Conservation of matter ও energy এই মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করিয়াছে। সুতরাং এই জড়ের— অথবা এই জড়ের সূক্ষ্মতম অংশ অণুর মূলে একটা কি আছে, যাহা হইতে এই জড় সৃষ্টি হইয়াছে। এই পদার্থটাকে বিজ্ঞান শক্তি বলে। হবার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিত বুঝিয়াছেন যে, Matters (atoms) are centres of force এই শক্তি সুতরাং জড় পরমাণুর স্রষ্টা—জড়জগত স্রষ্টা এবং এই জড়ের গতিরও স্রষ্টা। জড়ের গতিকে বিজ্ঞান Motion বলে। সুতরাং দেখা গেল, বিজ্ঞান যাহাকে Matter ও Motion বলে, সে দুইটাই সৃষ্ট। এবং সেই জন্য তাহার স্রষ্টা কল্পনা করিতে হয়। এই স্রষ্টা এক শক্তি। এ কথা এস্থলে আর অধিক বিস্তার করিয়া বুঝাইব না।

এখন জড় জগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া জীব জগতের কথা বলা যাউক। জীব জগতের এক সম্পূর্ণ নূতন নিয়ম দেখিতে পাই। জড় যখন জড়কে আকর্ষণ করে, তখন তাহা হইতে গতিকে তাড়াইয়া দেয়, আর জড় যখন জড়কে প্রত্যাখ্যান করে, তখন সে গতির সহিত মিলিয়া যায়। কিম্বা এক কথায় জড়কে জড় আকর্ষণ করিলে

গতি চলিয়া যায়। আর গতিকে গতি আকর্ষণ করিলে জড় চলিয়া যায়। জড় রাজ্যের নিয়ম, সম পদার্থ সম পদার্থকে আকর্ষণ করে, আর বিষম পদার্থকে প্রত্যাখ্যান করে।* কিন্তু জীবজগতে এই নিয়মের বিশেষ হয়। এখানে জড় গতিকে ছাড়িয়া অন্য জড়ের সহিত গিয়া মিলে না। এখানে কি এক উচ্চতর শক্তিবলে জড়ে গতিতে মিশামিশি মাখামাখি। কে যেন জড় ও গতি উভয়কে আকর্ষণ করিয়া স্বায়ত্ত করিয়া লইতেছে। জড় জড়ের সহিত একা অধিক দূর মিলিতে পারেনা। গতিতে গতিতে এত মিশামিশিও আর কোথাও হয় না। বিজ্ঞানবিদ পাঠক জানেন, রাসায়নের, (Inorganic) যৌগিক পদার্থ গুলিতে ঊর্দ্ধসংখ্যা কুড়িটী পরমাণু মিলিতে পারে। কিন্তু Organic পদার্থে দুই শত, কখন বা দুই সহস্র পরমাণু এক হইয়া একটী Molecule সৃষ্টি হয়। জীব জগতে কি একটা উচ্চশক্তি জড় ও গতিকে লইয়া মিলায়—তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করে—তাহাদিগকে আপন মনমত করিয়া সাজায়—আপনার আবশ্যক মত বন্দোবস্ত করিয়া লয়।

"Essential characteristic of living organic matter is that it unites this large quantity of contained motion with a degree of cohesion that permits temporary fixity of arrangement."
First Principles. p. 297.

অথবা,—"Organic aggregates differ from other aggregates alike in the quantity of motion they contain, and the amount of rearrangement of parts that accompanies their progressive integration." Ibid. p. 299.

অতএব জীবজগতে যাহা দ্বারা জড় ও গতির এইরূপ মিলন হয়, তাহা এক উচ্চতর শক্তি। কেহ কেহ এই শক্তিকে Organic force বলে। কেহ কেহ ইহাকেই Vital force বলেন। এই শক্তি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই এইরূপ জড় ও গতির মিলন থাকে। তখনও গতি বিক্ষেপ শক্তির বলে জড় হইতে চলিয়া যাইতে চাহে—জড়ও এত গুরুতর মিলনে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। কিন্তু এই উচ্চতর শক্তিই তাহাদের বিক্ষেপশক্তিকে বাধা দেয়, তাহাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া থাকে। যতক্ষণ এই শক্তির ক্রিয়া থাকে, ততক্ষণই জীবন। তাহার পরই, জীবন যাইলে—এই শক্তি রূপান্তরিত বা স্থানান্তরিত হইলে (কারণ শক্তির বিনাশ নাই) গতি জড়কে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে—মৃত্যু এবং বিশ্লেষণ উপস্থিত হয়।

এই জীব জগতের নিম্নতম বিকাশ উদ্ভিদ। উদ্ভিদ হইতে ক্রমে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব, মৎস্য, সরিসৃপ, পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট হইতে ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্টতর জীবের—এবং অবশেষে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবজগতের এই ক্রমোন্নতির কারণ এই যে, ক্রমে ক্রমে অধিকতর শক্তি ও জড় আয়ত্বীকৃত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারাই ক্রমশ উচ্চতর জৈবিক শরীর সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য শরীরে জড়ের তুলনায় যে পরিমাণে গতি আয়ত্বীকৃত হইয়াছে, উদ্ভিদ শরীর

* পাঠক এই স্থলে চুম্বক ও বিদ্যুতের কথা মনে করিয়া যেন এই সাধারণ নিয়ম ভ্রমপূর্ণ মনে না করেন। বিষম চুম্বক আকর্ষণ করে বা বিষম তড়িত আকর্ষণ করে ইহাও, অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এই সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত বুঝিতে পারিবেন। এস্থলে তাহার বিস্তারিত বিচারের স্থান নাই।

হইলে, সেই পরিমাণ গতিই মনুষ্যশরীর অপেক্ষা বিশগুণ স্থান ও জড়পদার্থ অধিকার করিয়া ফেলিত। অতএব এই জীব জগতের মূলেও এক শক্তি নিহিত রহিয়াছে। যে শক্তির এক রূপ বিকাশে জড় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই আর একরূপ বিকাশে গতি (বা ভৌতিক শক্তি) সৃষ্টি হইয়াছে। এবং তাহারই আর এক রূপ বিকাশে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে।

আরও এক কথা আছে। আমরা এ পর্য্যন্ত জড় ও গতি এবং জীব, এই কয়টী বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি। ইহা ব্যতীত আর একটী বিষয় আছে। উদ্ভিদ এবং জীব, ইহাদের উভয়ের মধ্যেই জৈবিক কার্য্য দেখিতে পাই। তবে ইহাদের মধ্যে এরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদ কেন? সকলেই জানেন, জীব জগতে আর একটা নূতন ব্যাপার আমরা দেখিতে পাই—সেইটী মন। অতি নিম্নতম জীব হইতেই এই মনের অস্তিত্ব বুঝা যায়, তবে পুরুভুজের ন্যায় উদ্ভিদবৎ জীবে আমরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি না। ক্রমে ক্রমে উচ্চতর জীবে আমরা মনের বিকাশ বুঝিতে পারি। অবশেষে মনুষ্যে, মনের এক অংশ ইচ্ছা শক্তি বা অহং জ্ঞান, আর এক অংশ মনোবৃত্তি এবং এক অংশ বুদ্ধিরূপে সম্পূর্ন স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই। মনের সহিত জৈবিক কার্য্যের কিরূপ সম্বন্ধ আছে, বুঝান সহজ নহে, তবে মনের ক্রমবিকাশের সহিত যে এই জৈবিক ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহা স্থির। বোধ হয় যেরূপ জৈবিক ক্রিয়ার আধিক্যে জড় ও গতি অধিক পরিমাণে আহরীকৃত হয়, সেইরূপ মনঃশক্তির আধিক্যেও জৈবিক ক্রিয়ার অধিক পরিমাণে বিকাশ হয়। একথা পরে বলিতেছি।

এই জড় ও গতির তত্ত্ব বিজ্ঞান বা science আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়। জৈবিক ক্রিয়ার কথা শারীর-তত্ত্ব বা Physiology আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়, আর মনের তত্ত্ব মনোবিজ্ঞান বা Psychology আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। আর এই তিনের সামঞ্জস্য রাখিয়া সমস্ত জগত-কার্য্য বিষয়ে যে একীভূত জ্ঞান—এই তিনের মূলে যে সৎ স্বরূপ নিহিত আছে, তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকেই Philosophy বা দর্শন বলা যায়। পণ্ডিত হর্ব্বার্ট স্পেন্সর Philosophy অর্থে এইরূপ বুঝিয়াছেন,—

"Knowledge of the lowest kind is *ununified* knowledge; Science is partially *unified* knowledge: Philosophy is *completely unified* knowledge."

উচ্চ দর্শন মতে কি ভৌতিক জগত, কি জৈবিক জগত ও কি মন, সকলই মূলত, সেই এক আদি শক্তি হইতে জাত। এই আদি শক্তির একরূপ বিকাশকেই আমরা জড় বলিয়া বুঝি, আর এক রূপ বিকাশকেই আমরা জীব বলিয়া বুঝি। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হর্শেল বলিয়াছেন,—

"The universe presents to us with an assemblage of phenomena, *physical, vital, intellectual*; the connecting link between the world of intellect and matter being that of organised vitality occupying the whole domain of animal and vegetable life throughout which, in some way inscrutable to us, movements among the molecules of matter are originated of such a character, as apparently to bring them under the control of an agency other than physical superseding the ordinary laws which regulate the movement of inanimate matter, or in other words *giving rise*

to movements which would not result from the action of those laws interfered with, and therefore implying in the very same principle, the origination of force."

অতএব দেখা গেল, সেই একই শক্তি, যাহার (Actual play remains unintelligible) কখন ভৌতিক কার্য্য রূপে, কখন জৈবিক কার্য্য রূপে, আর কখন মনঃশক্তি রূপে আমাদের নিকট সর্ব্বদা প্রতিভাত হইতেছে। আমরা এই শক্তি স্বরূপ কি, তাহা জানি না—কখনও জানিতে পারিব না। কারণ "Conception given in phenomenal manifestations of this ultimate energy can in no wise shew us what it is." Herbert Spencer.

এস্থলে এবিষয়ের শেষ মীমাংসার পূর্ব্বে আর একটা বিষয় মীমাংসার আবশ্যক। আমরা এই যে তিন প্রকার শক্তির বিকাশের কথা বলিলাম, তাহার স্বতন্ত্র সত্তা কেহ কি দেখাইতে পার? জড়কে কখন কি শক্তি ছাড়া দেখিয়াছ? জড়ে ও শক্তিতে যে মাখামাখি ভাব, তাহার ব্যত্যয় কোথাও দেখিয়াছ কি? ইহারা যেন একটা দ্রব্যের দুটী অঙ্গ, একটা পক্ষীর দুইটী পক্ষ। বাস্তবিক Motion ছাড়া Matter নাই, আবার কোথাও Matter ছাড়া Motion নাই।

বাস্তবিক "Without its relation to, and union with force or motion matter has no existence just as force or motion has no existence without its relation to and union with inertia."

দার্শনিক বেনও তাহাই বলেন, তাঁহার মতে,

"Matter and force are not two things but one thing."

সুতরাং জড়ও গতি ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা বিজ্ঞানের সুবিধা জন্য কল্পনা মাত্র। ষ্টেলো সাহেব বলেন যে, "Matter is an ideal complement of two attributes belonging to all bodies alike." Concepts of Modern Physics.

আর এক কথা—জীব ছাড়া জড় কোথাও কেহ কি দেখাইতে পার? যেখানে জড় সেই খানেই জীব। এক ফোঁটা জলেও, অণুবীক্ষণ দিয়া দেখ, কোটী কোটী কীটাণু দেখিতে পাইবে। এমন ক্ষুদ্র কীটাণু আছে যাহার আয়তন এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও অল্প হইবে। এমন স্থান নাই যেথানে এই সকল কীটাণু দেখিতে পাইবে না। জলে অসংখ্য কীটাণু, স্থলে অসংখ্য কীটাণু, শূন্যে অসংখ্য কীটাণু।

"From innumerable and separate points of this teeming earth myriads of protoplasm spring into existence and serve as food for more highly organised rivals." G. H. Lewis.

এইরূপ "air contains invisible or ultramicroscopical particles."

আর অধিক কি দেখাইব। সংসারে এমন স্থান নাই যেখানে জীব নাই। এমন জড় নাই যাহার সহিত জীব নাই।

এখন কথা হইতেছে, জড়ের সহিত জৈবনিকের সম্বন্ধ কি? বিলাতে ব্যাসটিয়ান (Bastian) সাহেব তাঁহার Spontaneous generation নামক প্রবন্ধে এবং Beginnings of Life নামক পুস্তকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জড় হইতেই—জড় শক্তি হইতেই জীব উৎপন্ন হইতে পারে। তিনি দেখাইয়াছেন, জল আগুনে ফুটাইলে যখন তাহার সমুদায় জৈবনিক নষ্ট হয়, তখন তাহাকেও বোতলে সম্পূর্ণ রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, কিছুদিন পরে সেই জলেই জৈবনিক জন্মিয়াছে দেখা গিয়াছে। ইহাকেই Law of Archebiosis বলে। টিনডলের মত জড়বাদী পণ্ডিতও বলিয়াছেন;—"I discern in that matter the promise and potency of every form of life." Tyndall's Address 1874.

স্পেন্সর সাহেবও দেখাইয়াছেন;—
"The conception to which the physicist tends is much less that of a universe of dead matter than that of a universe everywhere alive: alive if not in the strictest sense, still in a general sense." Herbert Spencer.

অতএব যেরূপ জড়ের সহিত ভৌতিক শক্তি বা গতির পার্থক্য নাই—তদ্রূপ জৈবনিক ছাড়া জড়ও মিলে না। এই জগতে তাহাদের এত মিশামিশি যে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করা যায় না। আসল কথা, যাহাদিগকে সচরাচর জড় পরমাণু বলে, আমরা দেখাইয়াছি যে, তাহাদের একরূপ সম্মিলনে জড় পদার্থ উৎপন্ন হয়—রাসায়নিক Inorganic পদার্থ সৃষ্টি হয়। এই জড় পরমাণুরই আর একরূপ সম্মিলনে জৈবিক শরীর উৎপন্ন হয়—ও তাহার সহিত জৈবিক ক্রিয়ারও বিকাশ হয়। অর্থাৎ অবস্থা বিশেষে—

"Molecular force become structural."   Tyndall's Address.

আর এক কথা, জৈবিক ক্রিয়া (এক রূপ গতি ক্রিয়ার) রূপান্তর মাত্র। বলিয়াছি ত, জড়ের মিলনে গতি অন্তর্হিত হয়—কিন্তু জৈবিক ক্রিয়ার বশে জড় ও গতি একত্র সম্মিলিত হয়। সুতরাং জৈবিক ক্রিয়া গতির একরূপ বিকাশমাত্র। পণ্ডিত স্পেন্সর বলেন যে, এই জৈবিক ক্রিয়া কেবল "The metamorphosis of retained motion that accompany the metamorphosis of retained matter."

শুধু তাহাই নহে, স্পেন্সর আরও বলেন,
"The forces called vital, we have seen to be correlates of the force called physical." এবং "There is a correlation and equivalence between sensation and those physical forces which in the shape of bodily actions result from them."   First Principles.

সুতরাং যে গতি শক্তি জড়কে লইয়া ভৌতিক ক্রিয়া করে, তাহাই অন্য কারণে অন্য শক্তির বশে জৈবিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে।

কিরূপে এই শক্তি রূপান্তরিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মনঃশক্তি বা অন্য একটা শক্তি আছে, তাহার দ্বারা এইরূপ গতি ও জড় উভয়ই রূপান্তরিত হয়—জীব উৎপন্ন হয়।

অনেক জড়বাদী পণ্ডিত আবার এই উচ্চ শক্তি স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা বলেন যে, পরমাণুদিগের মধ্যে নাইট্রোজেন নামক যে মূল পদার্থ আছে, ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহাকে সাধারণত নিষ্ক্রিয় বোধ হইলেও, যখন ইহা অন্য মূল পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন ইহা অধিক পরিমাণে গতি আকর্ষণ করিয়া লয়। ইহার এই অসাধারণ ক্ষমতাতেই জৈবিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই জন্যই সমস্ত জৈবিক অণুর মধ্যে নাইট্রোজেন সংমিলিত থাকে। এই জন্য—বারুদ, গানকটন, ডিনামাইট প্রভৃতি দাহমান পদার্থ গুলি নাইট্রোজেন অণুর দ্বারা গঠিত হওয়ায় এরূপ গুণযুক্ত হইয়াছে। এই সকল জড়বাদী পণ্ডিতগণ এই সম্বন্ধে আরও দুই চারিটা যুক্তি দেখাইয়া থাকেন, সে সকল জটিল বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

সে যাহা হউক, জৈবিক ক্রিয়া যে রূপান্তরিত জড় ও গতির সম্মিলনে উৎপন্ন হয়, তাহা স্বীকার করিলেও—জড় ও গতির এইরূপে রূপান্তর হইবার কারণ আছে—তাহাদিগকে এইরূপে রূপান্তরিত করিবার জন্য উচ্চতর শক্তির ক্রিয়া আবশ্যক হয়—তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হয়।

কারণ, যখন মনঃশক্তি ও জৈবিক শক্তির

মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ আছে যে, তাহাদের মধ্যে একটীর আধিক্যে আর একটার আধিক্য হয়, একটী হ্রাস হইলে আর একটী হ্রাস হয়—তখন অনুমানের (Induction) অভ্রান্ত প্রমাণ বলে (method of concommitant variations) সাহায্যে একটীর সহিত আর একটীর যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হয়।

অতএব যেমন ভৌতিক জগতে জড় ও শক্তির সহিত মিশামিশি, সেই রূপ মনঃশক্তির সহিতও জড়ের ও শক্তির মিশামিশিতে জীবজগতের উৎপত্তি। তবে মনের বিকাশ সর্ব্বত্র আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয় না। জীব জগতে জৈবিক ক্রিয়ার সহিত যে মনের বিকাশ হয়, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না—তবে উদ্ভিদ্ জগতে এই মনের অস্তিত্ব আছে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয় বটে। উদ্ভিদবিদ্ পণ্ডিতেরা প্রাণীভুক (carnivorous) উদ্ভিদদিগের সম্বন্ধে বলেন যে, স্বভাবতই তাহারা আহার্য্য সংগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ কৌশল প্রদর্শন করে। বাস্তবিক যেখানে জৈবনিক ক্রিয়ার বিকাশ, সেই স্থলেই জৈবনিক শরীর রক্ষার্থ কোন না কোন রূপ কৌশল (?) আবশ্যক করে। চারিদিকের অবস্থা সমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়াই উদ্ভিদাদি পরিপুষ্ট হইতে হয়। জৈবনিক শক্তির প্রথম সংগ্রাম—বলিয়াছিত, জড় শক্তির সহিত চলিতে থাকে। ইহাতেই মনের এক রূপ নিম্নতম বিকাশ উপলব্ধি হইয়েছে। দেখ মনের একটী প্রধান অঙ্গ ইচ্ছা শক্তি। এই শক্তির নিম্নতম বিকাশ, দার্শনিকদিগের মতে "Spontaneity of movement" এবং "self-preservation." উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যে মনঃশক্তির এই নিম্নতম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

আরও দেখ, অঙ্গ পরিচালনে আমাদিগের একরূপ বৃত্তি উত্তেজিত হয়। রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক ক্রিয়া প্রভৃতি সাধারণ জৈবিক কার্য্যেই মনের চেষ্টার নিম্নতম বিকাশ দেখিতে পাই। উদ্ভিদেও সুতরাং মনের এই রূপ একটী নিম্নতম বিকাশ হয় না, তাহা বলিতে পার না। আসল কথা যেখানে জৈবনিক ক্রিয়ার বিকাশ—সেই খানেই তাহার মূলে অবশ্যই মনঃশক্তি নিহিত থাকিবে। বলিয়াছি ত, এই জৈবনিক ক্রিয়ার অধিক স্ফূর্ত্তির সহিত মনঃশক্তিরও স্ফূর্ত্তির আধিক্য দেখা যায়। অথবা মনঃশক্তির ক্রমবিকাশের জন্যই জৈবনিক ক্রিয়ার এবং তাহার সহিত জীব শরীরের (উদ্ভিদ শরীরের ও বটে) ক্রম-বিকাশ হয়। এই মানস শক্তির বিকাশ হইয়া একটা সীমায় না আসিলে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জৈবনিক ক্রিয়ায় তাহার সমুদায় শক্তি পর্য্যবশিত না হওয়ায় তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্তির উপায় না হয়, সে পর্য্যন্ত মনের কার্য্য আমাদের উপলব্ধি হয় না। আসল কথা, জৈবিক ক্রিয়াই মনঃশক্তির সাধারণ কার্য্য। এই সাধারণ বা সামান্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও মনঃশক্তির কতক অংশ বাকী থাকিলে তবে তাহার বিশেষ ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হয়। এ কথা পরে বলিব।

অতএব দেখা গেল, আমরা জগতে যে খানে যে বস্তু দেখি—তাহার কতটুকু জড়, কতটুকু গতি, আর কতটুকু মন, তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি না। এইমাত্র জানি যে, জগতে জড়ের স্বতন্ত্র সত্তা নাই,

গতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই—এবং মনেরও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সকলেরই কি একরূপ মিশামিশি ভাব—কি একরূপ মাখামাখি ব্যাপার। গাছ, পাথর, মাটি যাহা কিছু দেখ—সকলের মধ্যেই শক্তির এই ত্রিমূর্ত্তি বিরাজমান। বলিয়াছিত, তুমি সাবধানে প্রস্তুত করা, পরীক্ষিত, রাসায়নিক পণ্ডিতের যত্ন-রক্ষিত একটু অম্লজান বায়ু অথবা এক টুকরা কয়লা লও। অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখ, ইহাতেও জৈবনিক দেখিতে পাইবে। চোয়ান জল লইয়া দৃঢ় বন্ধ করিয়া রাখ, কিছু দিন পরে তাহাতেই বড় বড় কীটাণু দেখিতে পাইবে।

অতএব মন, জড়, ও শক্তি এতিনের স্বতন্ত্র সত্তা কোথাও দেখিতে পাও কি? বাস্তবিক এই তিনই এক শক্তির বিভিন্ন রূপ মাত্র। আমরা কেবল বোধসৌকার্য্যার্থে ইহাদিগকে বিভিন্ন করিয়া লইয়া থাকি এই পর্য্যন্ত।

মূল শক্তির এই তিনরূপ বা তিন প্রকার বিকাশের কথা বলা শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এই একটী শক্তির এরূপ সম্বন্ধ আছে যে যখন একটীর বিকাশাধিক্য হয়, তখন অন্যগুলি অভিভূত থাকে। আমরা একথা কতক পরিমাণে পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। বলিয়াছি যে জড় শক্তির নিয়ম এই যে, যখন জড়ের সম্মিলন হয়—তখন তাহার অন্তর্ভূত শক্তি বা গতি দূর হইয়া যায়। জড়ের সম্মিলনের নিয়মই এই। আর এক কথা, জড় জড়ের সহিত অধিক দূর মিশিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড় জোর কুড়িটী পরমাণু লইয়া একটী Inorganic molecule হইতে পারে। কিন্তু জৈবনিক ক্রিয়া সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র। এ শক্তি জড়পরমাণুকেও চায়, আবার তাহার সহিত জড় শক্তিকেও চায়। সুতরাং ইহা জড় ও গতিকে স্বায়ত্ত করিয়া রাখে। কিন্তু জড় শক্তি এই অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে; অতএব যদিও জড় ও জৈবনিক শক্তি উভয়ে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহাদের এক জনকে আর এক জন অভিভূত করিয়া রাখে।

মনুষ্য শরীরের ন্যায় উচ্চ জৈবনিক শরীর যখন বিনষ্ট হয়, তখন তাহার কতক নিম্ন জৈবনিক শরীর (Bactria প্রভৃতি,—Modern germ theory of decay দেখ) এবং কতক জড় ও জড় শক্তি রূপে পরিণত হয়, তখন তাহার উচ্চতর জৈবনিক-ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, অথবা অন্যরূপে রূপান্তরিত হয়।

কোন্ ক্রিয়াকে আমরা জৈবনিক ক্রিয়া বলিব, তাহা মোটামুটি স্থির করিয়া রাখা উচিত। Life বা Vitality বলিলে যত টুকু বুঝায়, তাহা স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মানুষের শরীরেই এই জৈবনিক ক্রিয়ার উচ্চতর বিকাশ। মানুষের জৈবনিক ক্রিয়া সম্বন্ধে ডাক্তরগণ কি বলেন, তাহা এই স্থলে দেখাই।—"Animal life is nothing more or l[illegible]ntinued transformation of [illegible] the ceaseless operations of t[illegible]sing processes of waste and [illegible] * * * These two grand [illegible] of supply and waste co[illegible] functions of digestion, a[illegible]ption, circulation, assimilation, respiration, and excretion."

Hunter on Hydropathy p. 18.

অথবা দেশী কথায় বলিলে প্রাণ (Respiration) অপান (Excretion) সমান (Digestion) উদান (Assimilation ও Absorption) এবং ব্যান (Circulation)

এই কয়টী ক্রিয়াই জৈবিক কার্য্য। মনুষ্য হইতে যত আমরা নিম্নতর জীবে যাই, ততই এই জৈবিক ক্রিয়ার কার্য্য কমিতে থাকে, তাহার আর এত বহুরূপ বন্দোবস্ত থাকে না। উদ্ভিদ মধ্যে এই ক্রিয়া আরও সরল, সেখানে Absorption, Assimilation ও Circulation এই কয়টী সামান্য পরিমাণে দেখা যায় মাত্র।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই জৈবিক ক্রিয়ার মূলে আমরা আর এক শক্তি দেখিতে পাই। জৈবিক ক্রিয়াও বাস্তবিক ধরিতে গেলে এই শক্তির অধীন। এই শক্তিকে আমরা মানস শক্তি বলিয়াছি। বলিতে গেলে এই জৈবিক ক্রিয়া ইহার বৃত্তি বিশেষ মাত্র। যখন জৈবিক ক্রিয়া অতি সামান্য হয়, তখন জৈবিক ক্রিয়াই প্রবল হয়, তাহার মূলে কারণ স্বরূপে যে মনঃ শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহা অনুভূত হয় না। বাস্তবিক তখন জৈবিক ক্রিয়া ও মনঃশক্তির কার্য্য উভয়ের কোন ইতর বিশেষ থাকে না। বলিয়াছিত, সমস্ত উদ্ভিত জগতে এই নিয়ম। তখন ক্রিয়া শক্তির দ্বারা মনঃশক্তি অভিভূত থাকে।

অতএব জগতের সমস্ত রাসায়নিক কঠিন ও তরল পদার্থের মধ্যে যদিও জড়, গতি ও মনঃশক্তি [illegible] নিহিত আছে, কিন্তু তাহাতে জড় [illegible] র আধিক্য জন্য গতি অভিভূত [illegible] তাহার অতি সামান্য অংশ কখন কখ [illegible] জঃ রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। এবং তাহার মধ্যে মনঃশক্তিও নিহিত থাকে, কারণ তাহার কার্য্য যে জৈবিক ক্রিয়া, তাহা জড় পদার্থের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে (কেবল অনুশীলন দ্বারাই তাহা উপলব্ধি হয়)। এইরূপ বায়ু, তেজঃ প্রভৃতির মধ্যে গতিরই আধিক্য থাকে, জড় তাহার মধ্যে অভিভূত বা প্রচ্ছন্ন থাকে মাত্র এবং তাহার সহিত জীবও বর্ত্তমান থাকে। জীবের মধ্যে জড় ও গতি এবং মনঃশক্তি যে নিহিত থাকে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

অতএব জগতে যে তিন শ্রেণীর বস্তু দেখিতে পাই, যে ভৌতিক জগত (Inorganic world) জৈবিক জগত (Organic world) এবং মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চতর জীব জগত (Animal world) দেখিতে পাই, তাহারা জড়, গতি ও মন এই তিনের সমবায়ে উৎপন্ন। ভৌতিক জগত জড় প্রধান, গতি ও মনঃ তাহার মধ্যে অভিভূত থাকে, বিশেষত তাহার মধ্যে মনের অস্তিত্ব আমরা সহজে কল্পনা করিতে পারি না। এইরূপ জৈবিক জগত গতি প্রধান। ইহাতে সাধারণ জড় ও গতি অভিভূত হওয়ায় এক নূতন রূপ গতি দেখিতে পাই। কারণ ইহার মধ্যে যদিও মন অভিভূত থাকে, তথাপি মনের ক্রিয়া যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে এই শক্তি কতক পরিমাণে অভিভূত থাকে। সাধারণ জীব জগতে মন ও গতির আধিক্য—তবে এখানে মনের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক,—তবে তাহা জৈবিক ক্রিয়ারূপে অনুভূত হয় মাত্র।

এখন মানুষের কথা বলা যাউক। মানুষের মধ্যে মনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ। জৈবিক ক্রিয়াকে অভিভূত করিয়া সমস্ত গতিকে—জড়কে অভিভূত করিয়া, মনের বিশেষ ক্রিয়ার বিকাশ হয়, এইখানেই তাহার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। অতএব যেমন ভৌতিক জগত জড়প্রধান, জৈবিক জগত গতিপ্রধান, সেইরূপ মানুষ মনঃপ্রধান।